দাম : দশ টাকা

# স্বস্তিকা

স্বীকৃতি ও নামকরণের পটভূমিতে উত্তরবঙ্গের ভাষা

— পৃঃ ১৯

ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ এবং গোরক্ষা আন্দোলন

—পৃঃ ৩১

৬৯ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা।। ২৯ মে ২০১৭।। ১৪ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

## ভারতীয় সেনার নতুন শক্তি আলট্রা লাইট হাউইৎজার

### কামানের পাঁচ-কাহন

- কামানটির ওজন ৩১৭৫ কেজি।
- ৫ থেকে ৮ জন সেনার বসার ব্যবস্থা।
- প্রতি মিনিটে ৫টি গোলা ছুঁড়তে সক্ষম।
- ৩০-৪০ কিমি দূরত্বের লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করতে পারে।
- ডিজিটাল ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেমে সমৃদ্ধ।

## গড়াপেটা খেলা খেলছেন মুখ্যমন্ত্রী আর বরকতি

—পৃঃ - ১২

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৬৯ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২৯ মে - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : বিজয় আঢ্য**

**সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**



দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩



**দাম : ১০ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।**

**Postal Registration No.-** KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57



দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com



স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।


# সূচীপত্র


**সম্পাদকীয়** □ ৫

**সংবাদ প্রতিবেদন** □ ৬-৯

**আন্তর্জাতিক আদালতের রায় উপেক্ষা করে কুলভূষণকে ফাঁসি দিতে চায় পাকিস্তান** □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

**খোলা চিঠি : তোরা যে যা বলিস ভাই দিদির সোনার হরিণ চাই** □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

**গড়াপেটা খেলা খেলছেন মুখ্যমন্ত্রী আর বরকতি** □ রন্তিদেব সেনগুপ্ত □ ১২

**রাজশাসিত কোচবিহারেও পুষ্ট হয়েছে বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডার** □ সাধন কুমার পাল □ ১৪

**মহানায়ক রাসবিহারী ও একালের আন্তর্জাতিকতাবাদীরা** □ অম্লান কুসুম ঘোষ □ ১৬

**স্বীকৃতি ও নামকরণের পটভূমিতে উত্তরবঙ্গের ভাষা** □ সুখবিলাস বর্মা □ ১৯

**বিশ্বের বহু দেশের সংস্কৃতিতেই কোনো কোনো প্রাণী বা গৃহপালিত পশুকে হত্যা বা খাদ্যবস্তু করা নিষিদ্ধ** □ দীপঙ্কর গুপ্ত □ ২৭

**ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ এবং গোরক্ষা আন্দোলন** □ সারদা সরকার □ ৩১

**বিপ্লবী জিতেন্দ্রনাথ গৈরিক বসনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ** □ অমিত ঘোষদস্তিদার □ ৩৩

**বিজেপি বিরোধীরা আজ নিঃস্ব, নিরস্ত্র** □ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৪১

**নিয়মিত বিভাগ**

**এই সময় ও সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ □ চিঠিপত্র : ২৯-৩০ □ অঙ্গনা : ৩৪ □ সুস্বাস্থ্য: ৩৫ □ খেলা : ৩৭ □ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ □ শব্দরূপ : ৪০**

## স্বস্তিকা

### আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

### মোদী সরকারের তিন বছর

নরেন্দ্র মোদী সরকারের সম্প্রতি তিন বছর পূর্ণ হল। এই তিন বছরে সরকারের বর্ণময় পরিক্রমার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণই আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয়। লিখবেন দিব্যজ্যোতি চৌধুরী, অম্লানকুসুম ঘোষ প্রমুখ। এছাড়াও থাকছে ড. অচিন্ত্য বিশ্বাসের পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয় পাঠ্যসূচিতে বাংলা ভাষাকে আবশ্যিকীকরণের উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা।

।। দাম একই থাকছে— ১০.০০ টাকা।।


বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## কুপ্রথা রদ নয়, নির্মূলীকরণ চাই

একটানা ছয় দিন ধরিয়া শুনানির পর গত সপ্তাহে তিন তালাক মামলার রায় স্থগিত রাখিয়াছে শীর্ষ আদালত। আর ইহার পরে পরেই শীর্ষ আদালতে এক হলফনামা দিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড জানাইয়াছে, কাজিদের সাহায্যেই তিন তালাক প্রথা রদ করিতে চায় ল' বোর্ড। সেই লক্ষ্যে কাজিদের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হইবে। এই প্রস্তাবে বলা হইবে, নিকাহনামাতেই তাঁহারা যেন 'তিন তালাক উচ্চারণ করিব না' এই শর্ত রাখিয়া দেন। প্রশ্ন উঠিয়াছে, কাজিরা ল' বোর্ডের প্রস্তাব মানিয়া লইবেন, ইহার নিশ্চয়তা কোথায়? দেশের সব কাজি ল' বোর্ডের এক্তিয়ারে পড়েনও না। ফলে সকলের কাছে কীভাবে এই প্রস্তাব পাঠানো হইবে। আবার সব সময়ে নিকাহনামা পড়াইবার জন্য কাজিদের দরকার পড়ে না। এই বিষয়ে দক্ষ অন্য কেহ নিকাহনামা পড়াইয়া দিতে পারেন। সেইসব ক্ষেত্রে এই প্রস্তাবটি কীভাবে কার্যকর হইবে? ল' বোর্ডের এই হলফনামা হইতে একটি বিষয় স্পষ্ট, শীর্ষ আদালত বা সরকারের হস্তক্ষেপের পরিবর্তে তিন তালাকের মতো প্রথার অবলুপ্তিতে তাঁহারা নিজেদের সমাজের ভূমিকাকেই অগ্রাধিকার দিতে ইচ্ছুক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিন তালাক মামলার শুনানির সময় শীর্ষ আদালত বলিয়াছে, মুসলমানদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের সর্বাপেক্ষা জঘন্য প্রথা হইল 'তিন তালাক। এই প্রথা ইসলাম ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়, তাই এই প্রথা বাতিল করিলে ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে আঘাত লাগিবে, এমন মনে করিবারও কোনো কারণ নাই।' কেন্দ্র সরকারের পক্ষ হইতেও জানানো হইয়াছে, শীর্ষ আদালত তিন তালাককে অবৈধ ও অসাংবিধানিক ঘোষণা করিলে মুসলিম বিবাহ সংক্রান্ত নতুন আইন আনিবে সরকার।

ল' বোর্ডের এই হলফনামা পেশে অনুমান, জাগ্রত মুসলমান সমাজ, বিশেষত মহিলা সমাজ এই প্রথা যে কোনোভাবে সহ্য করিতে রাজি নহে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিতেছে। তিন তালাক প্রথাটি নিজেদের সমাজের পক্ষে হিতকর নহে— এই বিষয়টি এযাবৎ তাহারা বুঝিয়াও বোঝেন নাই। প্রথাটির পক্ষে আদালতে সওয়াল করিয়াছেন। এখনও যে হলফনামা পেশ করা হইয়াছে সেখানেও তিন তালাক রদ করিবার বিষয়টিকে অনিবার্য ঘোষণা করা হয় নাই— কাজিদের মর্জির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। একদিকে তাহারা স্বীকার করিতেছেন, তিন তালাক ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নহে, শরিয়ত অনুসারেও এই প্রথাটি ঠিক নহে, অথচ তিন তালাক প্রথাটি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করিতে তাহারা রাজি নয়। যদিও তিন তালাক সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করিবার আর্জি জানাইলে ল' বোর্ডের প্রতিষ্ঠাই বাড়িত।

পার্সোনাল ল' বোর্ড একটি সামাজিক সংগঠন, তাই এই প্রথা অমান্যকারীকে সামাজিক বহিষ্কারের দাওয়াই যে তাহারা দিয়াছেন, তাহা কতটা যুক্তিসঙ্গত? এই বহিষ্কার কে সুনিশ্চিত করিবে? প্রশ্ন হইল, কোনো অপরাধকারীর বিরুদ্ধে এই সামাজিক বহিষ্কার কতটা কার্যকরী হইবে? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সামাজিক পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকে বহিষ্কার নয়, এই পাপ কাজ যাহাতে নির্মূল হয় তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেইসঙ্গে জনজাগরণও করিতে হইবে। বিশ্বে সেইসব সমাজই উন্নত যাহারা মহিলা ও নাবালকদের বিকাশের পথে অন্তরায়গুলি দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে। যে সমাজ শতাব্দী প্রাচীন প্রথাগুলিকে যুগোপযোগী করে নাই, তাহাদের বিকাশও হয় নাই। এক সময়ে হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হইত, এখন বালক-বালিকা দুইয়ের পক্ষেই তাহা কল্যাণকর নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক সমাজের সুস্থ বিকাশের জন্য প্রতিটি পরম্পরাই, তাহা সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় যাহাই হউক না কেন, কালের কষ্টিপাথরে বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

### সুভাষিতম্

*গুণিভিঃ সহ সম্পর্কং পণ্ডিতৈঃ সহ সৎকথাম্।*
*সুধীভিঃ সহ মিত্রত্বং কুর্বাণো নাবসীদতি।। (চাণক্য নীতি)*

*যে ব্যক্তি সর্বদা গুণীগণের সঙ্গে ওঠাবসা করেন, পণ্ডিতদের সঙ্গে বার্তালাপ করেন এবং সুধীগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন তিনি কখনও অবসন্ন হন না।*

# পাহাড়ে যুদ্ধের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি

# তিন দশক পর সেনার হাতে হাউইৎজার কামান

ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় সেনার পরিকাঠামোগত আধুনিকীকরণের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ভারতের স্থলবাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডার আরও আধুনিক করে তুলতে কামান কেনা হবে। সেইমতো দায়িত্ব দেওয়া হয় আমেরিকার বি এ ই সিস্টেমস পিএলসিকে। সম্প্রতি বরাত দেওয়া ১৪৫টি কামানের মধ্যে দুটি ভারতে এসে পৌঁছেছে। রাজস্থানের পোখরানে পরীক্ষামূলক ব্যবহারের পর তুলে দেওয়া হয়েছে সেনার হাতে।

সেনার কৌশলগত শক্তি বাড়াতে এই উদ্যোগ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বোফর্স কেলেঙ্কারির পর ভারতের কোনো সরকার বিদেশ থেকে কামান কেনার ব্যাপারে উৎসাহ দেখায়নি। এর পিছনে বিরুদ্ধ জনমতের চাপ যেমন ছিল ঠিক তেমনই ছিল রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতির অঙ্ক। ফলত ভারতের গোলন্দাজ বাহিনীর আধুনিকীকরণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। দিনের পর দিন স্রেফ প্রয়োজনীয় অস্ত্র না থাকার কারণে মার খাবার ফলে সেনার অন্দরে হতাশা বাড়ছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিক বলেন, 'কামানের পক্ষে অল্প সময়ে যে ক্ষতি করা সম্ভব, ভারি রাইফেল দিয়ে তা সম্ভব নয়। তাছাড়া, শত্রু যদি আড়ালে থাকে তাহলে রাইফেল দিয়ে কিছু করা যায় না। কিন্তু কামানের সাহায্যে অদৃশ্য শত্রুদের আঘাত করা সম্ভব।'

পাহাড়ে যুদ্ধের জন্য হালকা কামানের প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন ধরেই ভারতের সেনাবাহিনী অনুভব করছিল। চীনের আগ্রাসন নীতি যত তীব্র হয়ে উঠছে ততই বাড়ছে পাহাড়ে যুদ্ধ হবার সম্ভাবনা। চীনা আক্রমণের সম্ভাবনা হিমালয় পর্বত-সংলগ্ন রাজ্যগুলিতেই বেশি বলে মনে করছেন সেনা বিশেষজ্ঞরা। সেই কারণেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রক হালকা কামানের ওপর জোর দিয়েছিল। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখার পর সেনাবাহিনী আল্ট্রা লাইট হাউইৎজার এম-৭৭৭-কে বেছে নিয়েছে। এই কামান যে শুধু ওজনে হালকা তাই নয়, দরকার পড়লে ৭০° কৌণিক অবস্থানে থাকা শত্রুকে আঘাত করতে পারে এটি। বোফর্স সর্বোচ্চ ৪৫° পর্যন্ত আঘাত করতে পারত।

হালকা কামানের গুরুত্ব প্রথম বোঝা গিয়েছিল কার্গিল যুদ্ধে। একথা অনস্বীকার্য, কার্গিল যুদ্ধে ভারতের জয়ে বোফর্স কামানের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বস্তুত সেই সময় সেনার হাতে বোফর্স ছাড়া অন্য কোনো কামান ছিল না। ধনুষ তৈরি হয়েছে আরও পরে। কিন্তু ভারী কামান উপদ্রুত অঞ্চলে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া কার্যত অসম্ভব। ১৫-২০ দিন সময় লাগে। এই সুযোগে শত্রুসৈন্য এবং জঙ্গিরা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পালিয়ে যায়। কার্গিলে এরকম বহুবার হয়েছে। হাউইৎজারের ওজোন মাত্র ৩,১৭৫ কেজি। বায়ুসেনার বিমানে বা হেলিকপ্টারে এই কামান এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এক সেনাকর্তা বলেন,

'যন্ত্রেরও একটা জীবনকাল আছে। ত্রিরিশ বছর ধরে ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে বোফর্স কামানগুলি অকেজো হয়ে পড়েছিল। সেনা ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে বেশির ভাগকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। এই অবস্থায় নতুন কামান না কিনলে সেনার মনোবল তলানিতে গিয়ে ঠেকত।'

সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে নরেন্দ্র মোদী সিদ্ধহস্ত। আমেরিকার কোম্পানিটির সঙ্গে ভারতের চুক্তি নরেন্দ্র মোদীর মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের অধীন হওয়ায় তাঁর সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা আরও বেড়ে গেছে। সেনা সূত্রের খবর, ১৪৫টি হাউইৎজার কামানের মধ্যে ১২০টি তৈরি হবে ভারতে। বি এ ই সিস্টেমের ভারতীয় অংশীদার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে মাহিন্দ্রা গ্রুপ।

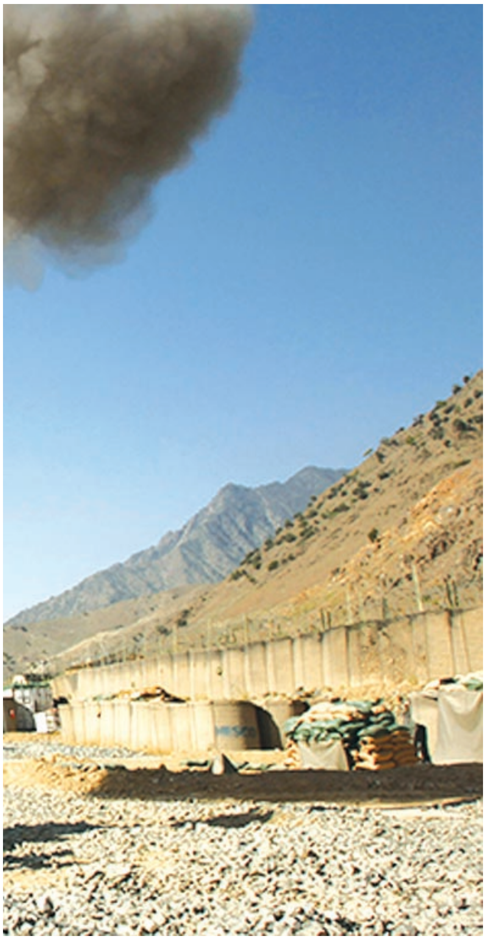

# হাউইৎজার এম ৭৭৭ কামানের খুঁটিনাটি

**মারণ ক্ষমতা :**

১৫৫ এম এম/৩৯ ক্যালিবারের হাউইৎজার এম ৭৭৭ কামান পাহাড়ি যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এই কামান মূলত ভারতের উত্তর এবং পূর্ব সীমান্তে কাজে লাগানো হবে। পশ্চিমবঙ্গের পানাগড়-স্থিত সেনাঘাঁটিকে শক্তিশালী করে তুলতে ব্যবহৃত হবে এম ৭৭৭। চীনের আগ্রাসনের পাল্টা জবাব দিতে পার্বত্য যুদ্ধে সেনাকে আরও পারদর্শী করে তোলার জন্য কেন্দ্র ২০২৫ সালের মধ্যে মোট ৪০,০০০ কোটি টাকা খরচ করবে।

**ওজনে হালকা :**

হাউইৎজার এম ৭৭৭-এর ওজন মাত্র ৩,১৭৫ কেজি। একে হেলিকপ্টারে ঝুলিয়ে খাড়া পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া সহজ। এম ৭৭৭ টাইটানিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি। মার্কিন সরকারের ফরেন মিলিটারি সেলস প্রকল্পের অধীনে এই কামান কেনা হয়েছে।

**ক্ষেত্রসমীক্ষার ফল :**

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই মুহূর্তে ১,০৯০টি এম ৭৭৭ কর্মরত। এর প্রথম ব্যবহার হয়েছিল আফগানিস্তান এবং ইরাকে। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডার পর ভারত চতুর্থ দেশ যারা এম ৭৭৭-এর বিধ্বংসী ক্ষমতাকে স্বীকৃতি জানাল। যে দুটি কামান ভারতে এসেছে, পোখরানে তাদের পরীক্ষামূলক ব্যবহারের পর সেনার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

**মেক ইন ইন্ডিয়া :**

যে দুটি কামান ভারতে এসেছে সেগুলি ছাড়া আরও ২৫টি কামান আমেরিকা থেকে আসবে আগামী দু' বছরের মধ্যে। কিন্তু বাকি ১২০টি হাউইৎজার কামান তৈরি হবে ভারতে, নরেন্দ্র মোদীর মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের অধীনে। নির্মাতা সংস্থা বি এ ই সিস্টেমসের ভারতীয় অংশীদারের নাম মাহিন্দ্রা ডিফেন্স। চল্লিশটি বেসরকারি কোম্পানিকে নিয়ে গঠিত সাপ্লাই চেনের মাধ্যমে বিভিন্ন সেনাঘাঁটিতে ছড়িয়ে দেওয়া হবে কামানগুলি।

**আরও কামান :**

এম ৭৭৭-এর পর ভারতের হাতে আসবে ১৫৫ এম এম/৫২ ক্যালিবারের স্বয়ংক্রিয় কামান। গত ২১ এপ্রিল ভারতীয় সংস্থা লার্সেন ও টুব্রো এবং দক্ষিণ কোরিয়ার হ্যানওয়া টেকউইনের মধ্যে এই ব্যাপারে একটি ৭,২০০ কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তারা ১০০ কে ৯ বজ্র-টি কামান বানিয়ে সেনার হাতে তুলে দেবে। কিছুদিনের মধ্যে লার্সেন ও টুব্রো তাদের পুনের নিকটবর্তী তালেগাঁও-স্থিত কারখানায় উৎপাদন শুরু করবে এবং তিন বছরের মধ্যে সমস্ত কামান তৈরি করে সেনার হাতে তুলে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, হ্যানওয়া টেকউইনের তৈরি কে ৯ থান্ডারের উন্নত সংস্করণ কে ৯ বজ্র-টি উৎপাদনের কাজ শুরু করেছে সংস্থাটি।

# কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে কেন্দ্র

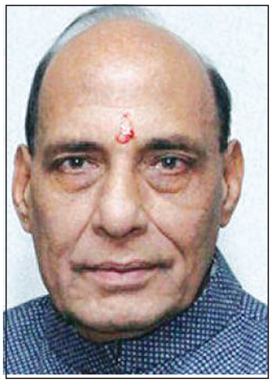

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** 'যত দ্রুত সম্ভব আমাদের সরকার কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের রাস্তা খুঁজে বার করবেই। আমরা মনে করি কাশ্মীর আর কাশ্মীরের মানুষ, আমাদের এক-একটি অঙ্গ। তাঁদের নিরাপত্তা ও সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য আমাদের সরকারকে যতদূর যেতে হয় যাবে।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ সিকিমে হিমালয়-সংলগ্ন পাঁচটি রাজ্যের নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর বিষয়ে একটি আলোচনা সভায় একথা বলেন। এদিন তিনি ওই সভায় আরো বলেন, 'কাশ্মীরের সমস্যাকে নিরন্তর সন্ত্রাসের ইন্ধন জুগিয়ে জটিল করে তুলছে পাকিস্তান। আমাদের সরকারের শপথ গ্রহণের দিন প্রতিবেশী সব দেশকে আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমরা শুধু হাতে-হাত মেলাতে পাকিস্তানকে ডাকিনি, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়কে মেলাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা সেই আবেদনে সাড়া দিলেন না। আর নিজেদের পরিবর্তন করতেও চেষ্টা করছে না। ওরা যদি পরিবর্তন না চায় তাহলে আমরাই ওদের পরিবর্তন করব। এটা বিশ্বায়নের যুগ। সেখানে একটি দেশ শুধু উগ্রপন্থায় মদত দিয়ে, সন্ত্রাস চালিয়ে যাবে। এটা কেউ মেনে নেবে না।' এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত, পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দিয়ে, কাশ্মীর সমস্যার দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যেই এগোচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

# এনরন মামলা : ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ

খাওয়ার কুরেশি

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** ২০০৪ সালের ঘটনা। দাভোল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর নির্মাতা-সংস্থা এনরন ভারতকে আন্তর্জাতিক আদালতে দায়ের করা একটি আরবিট্রেশন মামলায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ওই মামলায় কয়েক হাজার কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল এনরন। জাতীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি মামলায় কোনো এক রহস্যজনক কারণে তৎকালীন ইউপিএ সরকার হরিশ সালভেকে (সে সময় ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল) নিয়োগ না করে তার জায়গায় পাকিস্তানের আইনজীবী খাওয়ার কুরেশিকে নিয়োগ করে। যার পরিণতি, মামলায় ভারতের পরাজয় এবং ক্ষতিপূরণের দাবিতে স্বীকৃতি। উল্লেখ্য, এই কুরেশিই সম্প্রতি কুলভূষণ যাদব মামলায় আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতে পাকিস্তানের হয়ে সওয়াল করেছিলেন। বিপক্ষে ছিলেন হরিশ সালভে। ফলাফল সকলেরই জানা। ইউপিএ সরকারের এরকম একটি সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এটা যে দেশদ্রোহিতারই নামান্তর তা মেনে নিয়েছেন অনেকেই। বিজেপির মুখপাত্র জি ভি এল নরসিংহ রাও বলেন, 'এরকম একটি মামলায় কেন একজন পাকিস্তানি আইনজীবীকে নিয়োগ করা হয়েছিল তার জবাবদিহি কংগ্রেসকে করতেই হবে।'

# মেজর লিতুল গগৈকে সম্মান জানাল সেনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** সন্ত্রাসদমনে অভিনব উদ্যোগ নেওয়ার জন্য মেজর লিতুল গগৈকে সম্মান জানাল সেনা। গত ৯ এপ্রিল পাথর ছুঁড়তে থাকা জনতার হাত থেকে কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী এবং নির্বাচনকর্মীকে বাঁচানোর জন্য মেজর গগৈ এক উন্মত্ত যুবককে তার নিজের জিপের সামনে বসিয়ে বেঁধে রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে পাথর ছোঁড়া বন্ধ হয় এবং তারা নিশ্চিন্তে জায়গাটি পার হয়ে যান। সময়োপযোগী এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তাঁকে সম্মান জানিয়েছে সেনাবাহিনী। অন্যদিকে, বিজেপি সাংসদ এবং অভিনেতা পরেশ রাওয়াল সেনার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে, লেখিকা অরুন্ধতি রায়কেও ওইভাবে জিপে বেঁধে কাশ্মীরে ঘোরানো উচিত বলে মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, অরুন্ধতি প্রায়ই যুক্তি-কুযুক্তির পরোয়া না করে কাশ্মীরে নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর সমালোচনা করেন।

# ঢেলে সাজানো হচ্ছে চীন-ভারত সীমান্ত-রাস্তা

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** এবার হিমালয় অঞ্চলের পাঁচটি রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হলো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কিছুদিনের মধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে পাঁচটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে ডাকবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে আমাদের দেশের জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশের ৩৪৮৮ কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে চীন-ভারত সীমান্তে। কেন্দ্রীয় সরকার চাইছেন, রাস্তা, সেতু ও সড়ক যোগাযোগের সমস্ত রকম পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে। যাতে, যদি কোনোদিন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহলে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলায় সড়কপথকে খুব সহজে ব্যবহার করা যায়।

## ভূপতিনগরে দুষ্কৃতীদের হামলা, আহত ১১

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া মহকুমার সুতাহাটা থানার ভূপতিনগরে মুসলমান দুষ্কৃতীদের হামলায় ১১ জন আহত হয়েছেন। ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ এবং সুতাহাটা থানায় দায়ের করা এফআইআর (কেস নং ১৬৮/১৭ ১৬/৫/১৭) অনুযায়ী, এ মাসের ১৬ তারিখে ভূপতিনগর লাগোয়া রামচন্দ্রপুরের জনাচারেক দুষ্কৃতী ভূপতিনগরের সমিত বেরার নারকেল বাগানে ঢুকে জোর করে নারকেল পেড়ে খেতে শুরু করে। বাধা দেওয়া হলে তখনকার মতো তারা ফিরে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ১০-১৫ জনকে সঙ্গে নিয়ে আবার ফিরে আসে। শুরু হয় ব্যাপক মারধর। সমিত বেরা এবং তার পরিবারের ওপর লাঠিসোটা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুষ্কৃতীরা। প্রতিবেশীরাও মার খান। দুষ্কৃতীদের সঙ্গে আসা জামিলা বিবি নামে একজন মুসলমান মহিলা দু'জন গুরুতর আহত আশিস পড়ুয়া এবং অক্রুর পড়ুয়াকে গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। আশপাশের গ্রাম থেকে হিন্দুরা এসে পড়ায় দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। আহতদের ৭ জনকে হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, গুরুতর জখমরা কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ছত্রছায়ার মুসলমানদের একাংশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রভুত্ব কায়েম করার মানসিকতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ।

## খুনের হুমকি, ধর্ষণ, ধর্মান্তরণ
## হিন্দু যুবতীর অভিযোগ নিল না পুলিশ

**নিজস্ব প্রতিনিধি ॥** হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের ঘটনা। এক চব্বিশ বছরের হিন্দু যুবতীকে দিনের পর দিন ধর্ষণ, খুনের হুমকি, হত্যার চেষ্টা এবং জোর করে নিষিদ্ধ মাংস খাইয়ে ধর্মান্তরণ করা সত্ত্বেও পুলিশ কোনো অভিযোগ নেয়নি। উপরন্তু এক থানা থেকে অন্য থানায় পাঠিয়ে হয়রানির একশেষ করে ছেড়েছে। খবরে প্রকাশ, চম্পা সরকার (নাম পরিবর্তিত) নামের ওই তরুণীকে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে ধর্ষণ করে এক মুসলমান যুবক। ধরা পড়ে যাওয়ার পর অনুশোচনার অভিনয় করে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। হৃদ্দগরিব চম্পা এবং তার মা এতে আপত্তির কিছু পায়নি। পরে জানা যায় রাজা ব্যানার্জি নামের ওই অভিযুক্ত যুবকের আসল নাম আফতাব। বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পর আফতাব দীর্ঘদিন কোনো যোগাযোগ না রাখায়, চম্পা খোঁজ করতে তার বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানেই চম্পা আফতাবের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারে। অভিযোগ, আফতাব তাকে বাড়িতে বন্দি করে রেখে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে। একদিন গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে খুনের চেষ্টাও হয়। এর কিছুদিন পর স্থানীয় এক মৌলবির উপস্থিতিতে জোর করে গোমাংস খাইয়ে চম্পাকে ধর্মান্তরিত করা হয়। চম্পা প্রথমে খড়দহ পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেখান থেকে বলা হয়, এটা শ্রীরামপুর পুলিশের কেস। শ্রীরামপুর থানা সব শুনে তাকে শ্রীরামপুরেরই বিশেষ মহিলা থানায় পাঠিয়ে দেয়। চম্পা এবং তার মা এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। অভিযোগ, আফতাব এবং তার গুণ্ডাবাহিনী যে-কোনো মুহূর্তে তাদের ওপর চড়াও হয়ে খুন করতে পারে।

## উবাচ

“নির্বাচন কমিশন সরকারের অর্থ যোগানের পক্ষে নয়। নির্বাচনী ব্যয়ের নজরদারির ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন দরকার।”

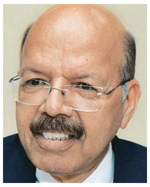

**নাসিম জাইদি**
কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনার

*পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে জমা দেওয়া রিপোর্টে।*

“পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনবই। তার জন্য যতবার দরকার হয় পশ্চিমবঙ্গে যাব।”

**অমিত শাহ**
সর্বভারতীয় সভাপতি, বিজেপি

*পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির রাজনৈতিক সম্ভাবনা প্রসঙ্গে।*

“ভগবদ্গীতার শিক্ষা দেশের তরুণ সমাজকে উন্নতমানের চিন্তাধারার ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে। সমৃদ্ধ করবে তাদের ব্যক্তিত্ব। ভগবদ্গীতা হলো এমন একটি সাহিত্য, যেখান থেকে সব বয়সি মানুষ শিক্ষা নিতে পারে।”

**রমেশ বিধুরি**
বিজেপি সাংসদ

*ছাত্র-ছাত্রীদের গীতা পাঠের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে।*

“দেশে যদি পণ্য ও পরিষেবার কর (জিএসটি) চালু হয়, তাহলে আখেরে ভারতেরই ভালো হবে। আজকে আশ্চর্য লাগছে হঠাৎ কী হলো, যার জন্য তিনি (পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী) এই পন্থা অবলম্বন করলেন। এতে রাজ্যই আরও পিছিয়ে পড়বে।”

**সুপর্ণ মৈত্র**
শিল্প বিশেষজ্ঞ

*রাজ্য বিধানসভায় জিএসটি বিল না করার প্রসঙ্গে।*

“দেশের জাল ড্রাইভিং লাইসেন্স রুখতে এবার চালু হচ্ছে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় দেশের সব ড্রাইভিং লাইসেন্স একটি জায়গায় নথিভুক্ত হবে, বিনা পরীক্ষাতে কেউ আর ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবে না।”

**নীতীন গড়করি**
কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী

*একটি প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফিনালেতে ভাষণ প্রসঙ্গে।*

# আন্তর্জাতিক আদালতের রায় উপেক্ষা করে কুলভূষণকে ফাঁসি দিতে চায় পাকিস্তান

পাক-ভারত যুদ্ধের আশঙ্কা ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। কারণ, কাশ্মীরের দখল নিতে পাকিস্তান যুদ্ধ চাইছে। আজকে যে অগ্নিগর্ভ কাশ্মীর আমরা দেখছি তা পাকিস্তানের মদতে তৈরি হয়েছে। 'আজাদ কাশ্মীর' যারা চাইছে তারা সেখানের মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। আজাদির অর্থ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। তাহলে আজাদি থাকবে কীভাবে? পাকিস্তান বলছে, নেহরুর প্রতিশ্রুতি মেনে বর্তমান ভারত সরকার কাশ্মীরে গণভোট করাক। ভাল কথা। কিন্তু নেহরু বলেছিলেন কাশ্মীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরলে তবেই গণভোট হতে পারে। এই শর্তটি পাক জঙ্গিরা মানছে না। পাক সরকার মানছে না। পাক সেনারা গত এক মাস ধরে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভিতরে এসে হামলা চালাচ্ছে। পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ হুমকি দিচ্ছেন কাশ্মীর পেতে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালাতে প্রস্তুত। সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই ভারত এমন হুমকি শুনছে। আমার হিসেবে অন্তত চারবার ভারত পাকিস্তানের হামলা প্রতিরোধ করেছে। চারবার পাকিস্তান লড়াইতে হেরেছে। তবু লজ্জা নেই। যুদ্ধ, যুদ্ধ বলে পাক শাসকরা চিৎকার করে যাচ্ছে। পাকিস্তানে নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গড়া হয় না। বন্দুকের নলই সেখানে ক্ষমতার উৎস। সেনাবাহিনী সরকার গঠন করে। পাকিস্তানে বড় মুখ করে বলার মতো শিল্প-কারখানা নেই। কৃষির অবস্থা খুবই খারাপ। দেশ প্রতি বছর দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। লাহোর, করাচি বা ইসলামাবাদ দেখে পাকিস্তানের বাস্তব পরিস্থিতি বোঝা যাবে না। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান সব কিছুই তলানিতে। পাক শাসকরা জনরোষ থেকে বাঁচতে তাই ভারত বিরোধী আগ্রাসনের কথা বলে।

পাক শাসকরা যুদ্ধের কথা বলবে সেটাই স্বাভাবিক। জন্ম সময় থেকে পাকিস্তান শান্তির কথা বলেনি। কিন্তু এবার যেটা আমার কাছে বিপজ্জনক লাগছে তা হলো আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতের রায় মানল

**গূঢ় পুরুষের**

**কলম**

না পাকিস্তান। ভিয়েনা কনভেনশনকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে পাকিস্তান বিশ্বকে বোঝাতে চাইছে যে প্রয়োজনে ভারতকে শায়েস্তা করতে তারা পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পিছপা হবে না। এখানে উত্তর কোরিয়ার শাসকের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের কণ্ঠস্বরের মিল আছে। আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতের ১১ জন বিচারক সর্বসম্মতভাবে রায় দিয়েছেন যে ভারত ভিয়েনা কনভেনশন মেনেই কুলভূষণ যাদবের সঙ্গে তার দূতাবাসের কূটনৈতিক কর্মীদের সাক্ষাৎ করার অনুমতি চেয়েছে। এই আদালত সেই অধিকার ভারত সরকারকে দিয়েছে। পাকিস্তান মেনে নিয়েছে যে কুলভূষণ যাদব ভারতীয় নাগরিক। তাই ভিয়েনা কনভেনশন মেনেই কুলভূষণকে আইনি সহায়তা দেওয়ার অধিকার ভারতের আছে। চূড়ান্ত রায়ের আগে কুলভূষণকে ফাঁসি দিতে পারবে না পাকিস্তান।

পাকিস্তান আন্তর্জাতিক আদালতের রায় মানতে চাইছে না। উদ্বেগটা ঠিক এখানেই। পাকিস্তান যুদ্ধ বাধাতে যে-কোনো সময়ে কুলভূষণকে ফাঁসি দিতে পারে। পাকিস্তান বলছে, 'ভিয়েনা কনভেনশন গুপ্তচরবৃত্তিতে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য নয়। কুলভূষণকে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে পাক সেনা আদালত মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।' বিশ্বের সমস্ত সভ্য দেশেই বিচার চলাকালে আত্মপক্ষ সমর্থনের আইনি অধিকার অভিযুক্তদের থাকে। পাকিস্তানে অভিযুক্ত ভারতীয় নাগরিকদের সেই অধিকার নেই। কেন? পাকিস্তান কি অসভ্য দেশ? প্রাথমিকভাবে মামলায় হেরে যাওয়ার পর পাকিস্তান আন্তর্জাতিক আদালতে ভারতের মোকাবিলায় পুরো প্রস্তুতি নিয়ে দ্বিতীয় দফায় লড়তে নামছে। মামলার প্রথম দফায় পাকিস্তানের আইনজীবী ছিলেন খাওয়ার কুরেশি। তিনি বুঝেছিলেন মামলায় হার নিশ্চিত। তাই মামলায় সওয়াল করার আগেই কুরেশি পাক সরকারের কাছ থেকে ফি বাবদ পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড আগাম নিয়ে নেন। সেখানে ভারতের আইনজীবী হরিশ সালভে নেন মাত্র এক টাকা। উদাহরণটা দিলাম এই কারণে যে পাকিস্তানের তুলনায় ভারতের নাগরিকদের স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ কত বেশি। পাক আইনজীবী কুরেশির ভাগ্য ভাল যে তিনি স্থায়ীভাবে ব্রিটেনে থাকেন। পাকিস্তানে বাস করলে সামরিক শাসকরা কুরেশির ধড়মুণ্ডু আলাদা করে দিত। পাক মিডিয়া কুরেশির মুণ্ড চাই বলে ক্রমাগত উস্কানি দিয়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে আইনজীবীরা নতুন দল গড়েছে। আমি বিশ্বাস করি মামলার দ্বিতীয় পর্বেও পাকিস্তানের হার হলে তারা একতরফাভাবে কুলভূষণ যাদবকে ফাঁসিতে ঝোলাবেই। বিশ্ব জনমতের তোয়াক্কা করবে না। পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক আদালতের নির্দেশ, ভিয়েনা কনভেনশন ইত্যাদির কোনো মর্যাদা নেই। সেখানে বন্দুক, সামরিক আইন শেষকথা বলে। তাই আন্তর্জাতিক আদালতকে উপেক্ষা করেই কুলভূষণকে ফাঁসিতে ঝোলাবে পাকিস্তান। ■

# তোরা যে যা বলিস ভাই দিদির সোনার হরিণ চাই

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

গরম কি উপভোগ করছেন? করছেন না, তবু সহ্য করতে হচ্ছে। সুতরাং দিদিকে সহ্য করতে না পারলেও উপভোগ করতে হবে।

দিদি ঠিক করেছেন সবাই তাঁর হবে। সুতরাং হতে হবে। অমিত শাহকে যে পরিবার আদর করে খাওয়াল তাঁদের কিনে নিতে হবে। ভক্তি চাই না, ভয় হলেই চলবে। বিরোধীরা পুরসভায় যেখানে যেখানে জিতেছে তাদের ভয় দেখিয়ে দলে টেনে নিতে হবে। না হলে ওই জয়ী প্রার্থীদের ধোপা, নাপিত বন্ধ করে দিতে হবে। সুতরাং, সহ্য না হলেও উপভোগ করুন।

দিদির নীতি হলো, রাজনীতিতে স্থায়ী বন্ধু বা স্থায়ী শত্রু বলে কিছু হয় না। প্রয়োজনে সবার হাতে তামাক খেতে হবে। সবাইকে তামাক পরিবেশন করতে হবে। শুধু স্বার্থ দেখা নীতিটিতি ওসব গরিবের জিনিস। পয়সা ফেলো, রাজনীতি করো।

সিপিএম হঠাও বাংলা বাঁচাও বলা দিদিও এখন সিপিএমের সঙ্গে হাত মেলাতে তৈরি। মোদীকে হঠাতে হবে। সুতরাং এখন দিদির নয়া নীতি। দিদি ক্ষমতা চেনেন। এখন যে বিজেপি শত্রু তারাই ক্ষমতার প্রয়োজনে দিদির বন্ধু ছিল। এ রাজ্যের ইতিহাস বলছে একদা তৃণমূল কংগ্রেস ভোটে লড়েছিল বিজেপির হাত ধরেই। সিপিএম এবং তাদের 'বি' টিম বলে চিহ্নিত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। তার পরেও কংগ্রেসের সঙ্গে কয়েকটি নির্বাচনে মমতা কখনও ঝাল, কখনওবা মিষ্টি সম্পর্ক রক্ষা করেছেন। রাজ্যের পরিবর্তন আনতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেছেন। আবার, গত বিধানসভা নির্বাচনে মমতাকে হটাতে সোনিয়া-রাহুলের কংগ্রেসও সিপিএমের সঙ্গে জোট বেঁধেছেন।

তারপরে এখনও একবছর কাটেনি। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এখন আবার মমতার হাত ধরতে চাইছেন। উল্টোটাও সত্যি। দিদি ম্যাডামের হাত ধরতে চাইছেন। কারণ, দুজনের কাছেই কমন শত্রু বিজেপি।

আজ এরাজ্যে মমতার প্রধানতম প্রতিপক্ষ দলটির নাম বিজেপি। আর গোটা দেশে শতাব্দীপ্রাচীন কংগ্রেসের অস্তিত্বের সামনে বড় প্রশ্নচিহ্ন দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বিজেপি। বিজেপি'র অশ্বমেধের ঘোড়াকে রুখে দিতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেস তো বটেই, তৃণমূলের মতো বহু দলেরও

কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার আশঙ্কা প্রবল। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন উদাহরণ তৈরি করে দিয়েছে। সুতরাং জোট বাঁধো তৈরি হও। ডাক দিয়েছেন মমতা দিদি।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে প্র্যাক্টিস ম্যাচ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। কিন্তু বড় জোট কি করা যাবে! দিদিকে সবাই আবার বিশ্বাস করে না। ◘

—**সুন্দর মৌলিক**

# গড়াপেটা খেলা খেলছেন মুখ্যমন্ত্রী আর বরকতি

**রন্তিদেব সেনগুপ্ত**

কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের বিতাড়িত ইমাম বরকতি কি আদৌ ভারতীয় নাগরিক? এই বিতাড়িত ইমামটির সঙ্গে রাজ্যের শাসকদল এবং শাসকদলের প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের রহস্যটি কী? এই দুটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের মানুষের মনে উঠতে বাধ্য। এই প্রশ্ন দুটি মানুষের মনে দেখা দিলে তাকে অন্যায় এবং অযৌক্তিকও বলা যাবে না। বরকতির সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং শাসকদলের ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি কোনো গোপন বিষয় নয়। বরং তারা পরস্পর যে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ, অনুরক্ত, তা তারা নিজেরাই বারবার প্রমাণ করে দিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সভামঞ্চে বিভিন্ন সময় এই বরকতিকে মুখ্যমন্ত্রীর পাশের আসন আলো করে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীসহ তৃণমূল কংগ্রেসের তাবড় নেতাদের দেখা গিয়েছে বরকতিকে সসম্মানে মঞ্চে স্বাগত জানাতে। বরকতিও এই মওকা ছাড়েননি। মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে, প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন— 'মমতাকে আমরাই মুখ্যমন্ত্রী করেছি।' এতেই থামার পাত্র নন এই বিতাড়িত ইমামটি। বলেছেন, 'এই রাজ্যে কে সরকার গড়বে তা আমরাই ঠিক করব।' এই রাজ্যের অন্য কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এই ধরনের কোনো মন্তব্য কস্মিনকালেও করেছেন বলে শোনা যায়নি। কিন্তু বরকতি করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে, মুখ্যমন্ত্রীকে শুনিয়ে শুনিয়ে করেছেন। রুষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, মুখ্যমন্ত্রীর এতে অস্বস্তি বেড়েছে— এমনও শোনা যায়নি। বরং মুখ্যমন্ত্রীর প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে বরকতির বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বদান্যতায় বরকতির তিন পুত্রের সরকারি চাকরি জুটেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে কান পাতলে এমনও শোনা গিয়েছে--- এই সরকারের আমলে এই রাজ্যের প্রথম তিন-চারজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের অন্যতম এই বরকতি। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বৃত্তে অবস্থান করেন। তাঁকে ধরলে অনায়াসে মুখ্যমন্ত্রীর অন্দরমহলে পৌঁছে যাওয়া যায়।

এহেন ক্ষমতাধর বরকতিকে অবশ্য শেষ পর্যন্ত টিপু সুলতান মসজিদের ইমামের পদটি খোয়াতে হয়েছে। অবশ্য শুধু পদ খোয়ানোই নয়। ইতিমধ্যে মসজিদ চত্বরে কারা এসে যেন তাকে চড় থাপ্পড় মেরে গেছে— এমনও শোনা যাচ্ছে। তবে এই পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছেন বরকতি নিজেই। মুখ্যমন্ত্রীর সস্নেহ প্রশ্রয়ে বরকতির অবস্থা হয়েছিল গ্যাসে ফোলা বেলুনের মতোই। তিনি নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে ভাবতে শুরু করেছিলেন। ভাবতে শুরু করেছিলেন, মসজিদের ইমাম হিসাবে তিনি এদেশের আইন কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতেই পারেন। তাই দেখাচ্ছিলেনও তিনি। টিপু সুলতান মসজিদের ইমামের অফিস ঘরে বসে তিনি একের পর এক ফতোয়া জারি করছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফতোয়া, রাজ্য বিজেপির সভাপতির বিরুদ্ধে ফতোয়া, যখন যার বিরুদ্ধে মন চেয়েছে ফতোয়া দিয়েছেন এই বরকতি। কোনো মুসলমান আর এস এস বা বিজেপিকে সমর্থন করলে তাদের শাস্তি দেওয়ারও হুমকি দিয়েছেন এই বরকতি। পশ্চিমবঙ্গে যেন শরিয়তি শাসন কায়েম হয়েছে— বরকতির হাবভাব দেখে তাই মনে হয়েছে মানুষের। যে রাজ্য সরকার রামনবমী এবং হনুমান জয়ন্তীতে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হেনস্থা করতে দ্বিধা করেনি; তারা কিন্তু বরকতির এই ফতোয়াবাজির বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটিও কাড়েনি। বরকতিকে সতর্ক করার কোনো পদক্ষেপই করেনি সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রামনবমীতে হিন্দুত্বের জাগরণ দেখার পর যিনি নিজেকে হঠাৎ 'সাচ্চা হিন্দু' বলে ঘোষণা করেছেন, যিনি ইদানীং সভায় সভায় 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির' বাণী শোনাচ্ছেন— সেই তিনিও ফতোয়াবাজ বরকতি প্রসঙ্গে অদ্ভুত নীরবতা অবলম্বন করেই চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য প্রশাসনের এই ভূমিকাকে কী বলা যাবে? বরকতির মতো ফতোয়াবাজকে এটাই প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় দেওয়া নয়?

এই বরকতি তাঁর গাড়িতে ইমাম হিসাবে লালবাতি পেতেন। কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের নেতারা যখন গাড়িতে লালবাতি পান না— তখন বরকতি কেন পেতেন, কে তাঁকে লালবাতি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিল— তা এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত। লালবাতির অধিকারীদের সরকারি তালিকা অনুযায়ী তাতে কোনো মসজিদের ইমাম পড়ে না। তবু বরকতির গাড়িতে লালবাতি ছিল। কেন তিনি গাড়িতে লালবাতি লাগিয়েছিলেন— সে প্রসঙ্গে বরকতি প্রথমে বললেন— 'ব্রিটিশ সরকারই এই আইন করে গিয়েছিল। সেই আইন অনুযায়ীই তারা বংশপরম্পরায় লালবাতি ব্যবহার করেন। কিন্তু টিপু সুলতান মসজিদ কমিটি বরকতির এই মিথ্যাটি ফাঁস করে দিয়েছে। তারা বলেছে— বরকতির পিতা এক সময়ে এই মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি একটি সাইকেলে চেপে মসজিদে আসতেন। সাইকেলে লালবাতি লাগানো যায় কিনা— সে নিয়ে অবশ্য বরকতি আর কোনো উচ্চবাচ্য না করে নিজের স্বপক্ষে দ্বিতীয় আর একটি যুক্তি দেখালেন। বললেন— 'মমতা বলেছে তাই আমি লালবাতি ব্যবহার করি।' আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কি সত্যি একটি মসজিদের ইমামকে তার ইচ্ছামতো গাড়িতে লালবাতি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন? যদি বরকতির কথা সত্যিই হয়, যদি মমতা সত্যিই বরকতিকে লালবাতি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েই থাকেন— তাহলে কেন দিয়েছিলেন? এর কোনো উত্তর কিন্তু এখনও পাওয়া যায়নি। কেননা, বরকতির এই দাবির কোনো বিরোধিতা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে করা হয়নি। এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর প্রশাসন কিছু বলেনওনি। অতএব ধরে নেওয়া যেতেই পারে 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং।'

রাজ্যের মানুষ এখন জেনে অবাক হচ্ছেন, একটি মসজিদের ইমাম দেশের যাবতীয় আইনকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে 'মমতা বলেছেন' তাই গাড়িতে লালবাতি ব্যবহার করতেন। বেআইনিভাবে তার এই গাড়িতে লালবাতি ব্যবহার করা নিয়ে যখন

সংবাদমাধ্যম প্রশ্ন করেছে--- তখন ক্ষুব্ধ বরকতি উত্তর দিয়েছেন— 'এটা পশ্চিমবঙ্গ, এখানে কেন্দ্রের আইন চলে না।' বরকতি জানেন কিনা জানি না— গাড়িতে লালবাতির ব্যবহার নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতেরই নির্দেশিকা রয়েছে। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী কেন্দ্র সরকার লালবাতি ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। কেন্দ্রের নির্দেশ মেনে সব কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মন্ত্রী, আমলা— প্রত্যেকেই গাড়ি থেকে লালবাতি খুলে ফেলেছেন। ব্যতিক্রম ছিলেন এই বরকতি। তিনি তো কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মানতেই চাননি বরং ওই মন্তব্য করে বুঝিয়ে দিয়েছেন— ভারত রাষ্ট্রের কোনো আইন মানতে তিনি বাধ্য নন। এতেও থেমে থাকার বান্দা নন বরকতি। এর পরও তিনি বলেছেন— 'ভারতের পঁচিশ কোটি মুসলমান পাকিস্তানের পক্ষে লড়াই করবে।' স্বাভাবিভাবেই এই প্রশ্ন উঠবে, বরকতি কোন দেশের নাগরিক? ভারতের, না পাকিস্তানের? ভারতীয় শরীর আর পাকিস্তানি মন নিয়ে তিনি এদেশে বসবাস করেন কীভাবে? কিন্তু বরকতির এইসব কথাবার্তার পরই খেলাটি জমে গেল। বরকতি ভেবেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় থাকায়, কলকাতায় বসে পাকিস্তানের হয়ে লড়াই করার কথা বললেও তার টিকিটি ছোঁয়ার সাহস কেউ দেখাবে না। এবার অবশ্য বিধি বাম। বরকতির এই বিবৃতিতে ধিক্কার ধ্বনি উঠল চারদিকে। তৃণমূল অন্দরের খবর, ওই দলেরই হিন্দু নেতৃত্ব বিষয়টি ভালো চোখে দেখেননি। এঁদের অনেকেই অবশ্য আগে থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বরকতির অতি ঘনিষ্ঠতায় ক্ষুব্ধ ছিলেন। বরকতির এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে এমনভাবে জনমত গড়ে উঠতে থাকল, যে, চাপে পড়ে গিয়েছিল প্রশাসনও। তৃণমূল সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ, এই সময়ই নাকি তৃণমূলের বরিষ্ঠ কয়েকজন নেতা মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝান— বরকতির গাড়ি থেকে লাল আলো খুলে ফেলার উদ্যোগ প্রশাসন নিক। নাহলে ভবিষ্যতে এ নিয়ে আইনগত বিপদ বাড়তে পারে। নারদা, সারদা, রোজভ্যালিতে বিপর্যস্ত মুখ্যমন্ত্রীও বুঝে যান— অন্তত লোক দেখাতে একটা কিছু করা দরকার।

এরপরই আসরে নামেন মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্রীসভার দুই সদস্য— ফিরহাদ হাকিম এবং সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ফিরহাদ হাকিম এক সাংবাদিককে গার্ডেনরিচ-মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে 'মিনি পাকিস্তান' দেখে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। খাগড়াগড় কাণ্ডে যখন জঙ্গি জেহাদিদের খোঁজ তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা— তখন জনাব সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এই তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দিয়েছিলেন মুসলমান জনসমাজকে, বর্ধমানের এক জনসভায়। শুধু তাই নয়, কলকাতায় এক প্রকাশ্য সমাবেশ থেকে, সিদ্দিকুল্লার উপস্থিতিতেই তার উগ্র মৌলবাদী সমর্থকরা হামলা চালিয়েছিল পুলিশের ওপর। মমতার নির্দেশে ফিরহাদ হাকিম গিয়ে বরকতিকে বোঝানোর পর গাড়ির লালবাতি খোলা হলো। আর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই, সিদ্দিকুল্লা সাংবাদিক সম্মেলন করে বরকতিকে একহাত নিলেন। তৃণমূল সূত্রের সংবাদ, এই খেলার অন্তরালে আর একজন ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমে পড়লেন। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসেরই সাংসদ— সুলতান আহমদ। বরকতির সঙ্গে সুলতান আহমেদের লড়াইটা হলো টিপু সুলতান মসজিদের দখলদারি নিয়ে। এবং এও শোনা যাচ্ছে, সুলতান আহমেদের কলকাঠিতে প্যাঁচে পড়া বরকতিকে টিপু সুলতান মসজিদের ইমামের পদ থেকে অপসারণ করা হলো। এখন অবশ্য বরকতি সুলতান আহমেদের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। তবে সে হলো তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের এক নোংরা খেলা। সে নিয়ে কিছু বলব না।

প্রশ্ন হলো, এই সমস্ত বিষয়টির মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাটি কী? দেশের ভিতর থেকেও পাকিস্তানের হয়ে জেহাদ করব— বরকতি এই কথা বলার পরও কি মুখ্যমন্ত্রী তার নিন্দা করেছেন? কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছেন? না। এখানে কেন্দ্রের আইন চলে না— একথা বলার পরও কি মুখ্যমন্ত্রী বরকতিকে তিরস্কৃত করেছেন? না, বরকতি কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী এখন অবধি প্রকাশ্যে একটিও কথা বলেননি। আসলে মুখ্যমন্ত্রী একটি গড়াপেটা খেলা খেলতে নেমেছেন। রামনবমীতে হিন্দু জাগরণ মুখ্যমন্ত্রীকে কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। অশনি সংকেতটি মুখ্যমন্ত্রী ধরতে পারছেন। রামনবমীর পর তিনি হিজাব পরা ছেড়েছেন। নিজেকে 'সাচ্চা হিন্দু' বলে দাবি করছেন। এখন বরকতির বিরুদ্ধে একটু লোক দেখানো ব্যবস্থা না নিলে চলে? কিন্তু সেটা নিজে নিতে গেলেও বিপত্তি। তাতে সামনের ভোটে বরকতি তাঁকে কৃপা না করতেও পারেন। অতএব, ফিরহাদ হাকিম আর সিদ্দিকুল্লাকে আসরে নামিয়ে দিলেন তিনি। বরকতির গাড়ির লালবাতি খুলে নেওয়া হলো। লোকে ভাবল— মুখ্যমন্ত্রী কতটা 'অসাম্প্রদায়িক।' তিনি বরকতিকেও তোয়াজ করলেন না।

সত্যিই কি তাই? আসলে খেলাটি যে গড়াপেটা তা বরকতিও জানেন। তৃণমূল সূত্রেরই সংবাদ, লালবাতি খোলার পাশাপাশি বরকতির কাছে এই বার্তাও মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে পৌঁছে গেছে যে, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতি যথেষ্টই সহানুভূতিশীল। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে কোনোরকম অসম্মান করতে চান না। বরকতিও জানেন, তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলা বা আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা এই মুখ্যমন্ত্রীর নেই। এখন চাপে পড়ে লালবাতি খুলতে হচ্ছে বটে, তবে সুদে-আসলে যে সেটা ভবিষ্যতে আদায় করে নেওয়া যাবে--- তা বরকতিও জানেন। লালবাতির পরিবর্তে অন্য কিছু পাওয়ার প্রতিশ্রুতিও বরকতির কাছে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে।

বাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠীকে খুব বোকা ভাবেন মুখ্যমন্ত্রী। ভাবেন তাঁর এই গড়াপেটা খেলা বাংলার হিন্দুরা বুঝতে পারবে না। মাথার হিজাব খুলে ফেলে দুদিন 'সাচ্চা হিন্দু' বললেই বুঝি হিন্দুর মন গলে জল হয়ে যাবে। কিন্তু বুঝতে পারছেন না, হিন্দুরা এ প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে— বরকতির বিরুদ্ধে মুখ খুলতে মুখ্যমন্ত্রীর এত দ্বিধা কেন? আর কেনই বা রাস্তার মোড়ে মোড়ে সততায় প্রতীক কাট আউট লাগানোর মতোই তাঁকে এখন জনসভায় 'সাচ্চা হিন্দু' বলে দাবি করতে হচ্ছে? মজার কথা হলো— এতকিছুর পর হিন্দুরা এই মুখ্যমন্ত্রীকে আর বিশ্বাস করে না। কিন্তু প্রশ্ন— মুসলমানরাই কি তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে? ■

# রাজ শাসিত কোচবিহারেও পুষ্ট হয়েছে বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডার

সাধন কুমার পাল

খ্যাতনামা লেখক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত রাজ শাসিত কোচবিহারের সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে বলেছেন, '*The ruling house of coochbehar deserves respectful mention in the history of Bengali literature for the valuable contribution of the Rulers both as authors themselves and as patrons to a large number of great and small poets. This efforts of the Ruling House of Coochbehar for centuries was, therefore, not inspired merely by a literary motive; it was something like a cultural mission of which Coochbohar may well feel proud and for which all Bengal should remain grateful to the Ruling House.*'

*রাজ শাসিত কোচবিহারে অনুবাদ সাহিত্যের পাশাপাশি মৌলিক সাহিত্যেরও উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয়েছিল। ওই সময় নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, বিষ্ণু, স্কন্ধ, ব্রহ্মবৈবর্ত, ভাগবত পুরাণের মতো অনেক পুরাণের অনুবাদ হয়েছিল। রাজাদের নির্দেশ ছিল পুরাণ এমন ভাবে রচিত হবে যে কঠিন তত্ত্বকথা যেন সাধারণ মানুষের কাছে সহজ হয়ে উঠে। যেমন, মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুবাদ প্রসঙ্গে রাজা বিশ্বসিংহের নির্দেশ দিয়েছিলেন—* 'এ কারণে শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার/নিজ দেশ ভাষাবন্ধে রচিয়ো পয়ার'।

রামায়ণ অনুবাদের জন্যও বিভিন্ন কবিরা কোচবিহার রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন। মহারাজা বিশ্বসিংহের রাজত্বকালে কবি দুর্গাবর ত্রিপদী ছন্দে যে রামায়ণ রচনা করেন তা 'দুর্গাবরী গীতিরামায়ণ' নামে পূর্ব ভারতে বিখ্যাত। মহাভারতের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছিল রাজ শাসিত কোচবিহারে। মহাভারতের অনুবাদকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন কবি হলেন রুদ্রদেব, দ্বিজরাম সরস্বতী, শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ দ্বিজ কবিরাজ, কবিশেখর প্রমুখ। ঐতিহ্য সম্পন্ন এই অনুবাদ সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ শাখাকে পুষ্ট করার পাশাপাশি কোচবিহারকেও গর্বিত করেছে।

কোচবিহারে সাহিত্য চর্চা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ এই সাহিত্যে অনেক বেশি পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ নেই, কোচবিহারে আছে। পুরাণাদির অনুবাদও সংখ্যার দিক দিয়ে কোচবিহারেই বেশি।

১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে মিত্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে অহোমরাজ-কে দূত মারফত পাঠানো মহারাজা নরনরায়ণের পত্রটিকে বাংলা গদ্যের প্রথম নিদর্শন হিসেবে ধরা হয়। পত্রটির একাংশ এরকম : 'লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তর যাচ্ঞা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে সে বর্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগেতে আছি তোমারো এ গোট কর্তব্য উচিত হয় না কর আপনে জান। অধিক কি লিখিম। শতানন্দ কর্মী, রামেশ্বর শর্মা, কালকেতু ও ধুমাসর্দার, উদ্ভাশু চাউনিয়া, শ্যামরায় ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।...'

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ নিজেই রামায়ণ, মহাভারত ও একাধিক পুরাণ অনুবাদেও হাত দিয়ে ছিলেন। যদিও কোনোটাতেই তিনি শেষ পর্যন্ত সফল হননি। তবে শ্যামাসঙ্গীত রচনায় তিনি নিজের সাহিত্য প্রতিভার প্রমাণ রেখেছেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ রচিত একটি শ্যামা সঙ্গীতের কিছুটা উল্লেখ করা হলো।

হায় তার কি সমনের ভয়/
মা যার শ্যামা হয়
অতুল অপ্রাপ্য চরণ তার কি উপমা হয়।

*ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন,*

*'It will not be exageration to say that the reign of Maharaja Harendra Narayan makes a chapter in the History of Bengali Literature of late eighteenth and early nineteenth centuries.'* মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণও বেশ কিছু শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন। শিবেন্দ্রনারায়ণের পত্নী মহারানি বৃন্দেশ্বরী দেবীও প্রতিভা সম্পন্না কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে আধুনিক কোচবিহারের জনক বলা হয়। নৃপেন্দ্রনারায়ণকে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বিক্রমাদিত্যের মতো মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজসভায় সকলেই সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রবক্তা কেশব চন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিতা সুনীতি দেবী রাজবধূ হয়ে এসে কোচবিহারে নারীশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা নেন। কোচবিহারকে আধুনিক রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলবার জন্য যে কর্ম মহাযজ্ঞ মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ শুরু করেছিলেন তাতে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছিলেন মহারানি সুনীতি দেবী।

দক্ষ শিকারি মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায় 'The seven years of big Game Shooting in Coochbehar, The Duars and Assam-A rough Dairy' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন। সুনীতি দেবীও বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। সুনীতি দেবী রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ হলো সাহানা (ছোট গল্প), ঝড়ের দোলা (গল্প সংকলন), শিশু কেশব (কেশব চন্দ্র সেনের বাল্যজীবন), সতী (গীতি নাট্য) ইত্যাদি। সুনীতি দেবী রচিত ইংরেজি গ্রন্থগুলির মধ্যে 'The Autobiography of An Indian Princess' এখনো ইংরেজি সাহিত্যের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। নিজের বাল্যকাল, সেই সময়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী নিজের বিবাহ ও ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লিখিত বইটি এখনো পাঠককুলকে আকর্ষিত করে। সুনীতি দেবীর পুত্র ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণও পিতা মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণের সহধর্মিণী নিরুপমা দেবী বাংলা সাহিত্যের জগতে এক উল্লেখযোগ্য নাম। নিরুপমা দেবী ১৯১৬ সনে 'পরিচারিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বনফুল, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, প্রিয়ংবদা দেবীর ও মতো সে সময়ের বিখ্যাত লেখকদের লেখা প্রকাশিত হোত। কোচবিহারের রাজপরিবার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চার আভিজাত্যে বাংলা ও বাঙালির কাছে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

কোচবিহারে ভাষা নিয়ে চলমান বিতর্কের পরিবেশে ড. শচীন্দ্রনাথ রায়ের 'সাহিত্য সাধনায় রাজন্য শাসিত কোচবিহার' গ্রন্থ থেকে কিছুটা অংশ তুলে ধরা যেতে পারে। ড. রায় লিখেছেন, 'কামতায় কোচ শক্তির অভ্যুত্থান ও বিকাশের অনেক আগে থেকেই কামরুপ তথা সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতে বিভিন্ন জন'রা বসতি স্থাপন শুরু করে। তাঁদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ছিল। আবার বহু বিচিত্র ভাষা ও সংস্কৃতির স্রোত এ অঞ্চলের উপর দিয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রবাহিত হওয়ার ফলে, জন-সাংকর্যের মতো ভাষা সাংকর্যও ঘটে। জনতত্ত্ব নিরুপণের ক্ষেত্রে পণ্ডিতমণ্ডলী যেসব বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, ভাষা বিচারের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ বাধার সম্মুখীন হয়েছে।

আপাত বিচারে ভাষা-সমস্যাটি তেমন কিছু জটিল বলে মনে হয় না। উদ্ভবকাল থেকেই এ রাজ্যের জনগণের বৃহত্তর অংশের কথ্য ভাষা বাংলা বা বাংলারই একটি উপভাষা। আর লেখ্যভাষা বরাবরই সমকালীন বঙ্গের লেখ্যভাষার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলেছে।'

**তথ্য সুত্র :**

(১) 'সাহিত্য সাধনায় রাজন্য শাসিত কোচবিহার— ড. শচীন্দ্রনাথ রায়।

(২) 'কামতাপুর থেকে কোচবিহার'— হিতেন নাগ।

(৩) 'মধ্য যুগের সাহিত্য কোচবিহার রাজদরবার'— সম্পাদনা দীপক কুমার রায়।

(৪) কোচবিহারের ইতিহাস— খান চৌধুরী আমানত উল্লা।

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP
SYSTEMATIC INVESTMENT PLAN
করুন
উন্নতি করুন
DRS INVESTMENT
Contact :
9830372090
9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
uti UTI Mutual Fund
HDFC MUTUAL FUND
SBI MUTUAL FUND A partner for life.

# মহানায়ক রাসবিহারী ও একালের আন্তর্জাতিকতাবাদীরা

অম্লানকুসুম ঘোষ

মরুভূমিতে পথশ্রমে ক্লান্ত পথিক অনেক সময় মরীচিকা দেখে জল ভেবে উদভ্রান্তের মতন পথ চলে আত্মজীবন নাশের কারণ হয়। বর্তমান আমাদের দেশের বহু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সেরকমই আন্তর্জাতিকতাবাদ বা বিশ্বমানবতাবাদ নামক কিছু কল্পিত আদর্শের মোহে বুঁদ হয়ে দেশদ্রোহিতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে। দেশের পক্ষে সংকটজনক এই দুঃসময়ে বড় ভাবতে ইচ্ছে করে সেই মহাপ্রাণের কথা যিনি কর্মে, ব্যক্তিত্বে ও প্রভাবে প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক হয়েও দেশপ্রেমকেই করেছিলেন তাঁর চলার পথের একমাত্র ধ্রুবতারা। মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর (২৫ মে, ১৮৮৫—জানুয়ারি, ১৯৪৫) জীবনালেখ্য এই যুগসন্ধিক্ষণে বড় মনে পড়ে।

১৯১৫ সালের মে মাসে ভারতে তাঁর বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার এবং তাঁর একান্ত অনুগামী বসন্ত বিশ্বাস, প্রবোধবিহারী, আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ এবং বিষ্ণুগণেশ পিংলের ফাঁসি হওয়ার পর রাসবিহারী বসু ছদ্মবেশে জাপান পাড়ি দেন সানুকি মারু জাহাজে চেপে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সেই সূচনালগ্নে কংগ্রেস যখন ইংরেজের যুদ্ধপ্রচেষ্টার একান্ত সহকারী এবং জাপান মহাযুদ্ধে ইংরেজের অন্যতম সহযোদ্ধা সেই সময়েই আন্তর্জাতিক কূটনীতির এই পরিণামদর্শী বিশ্লেষক নিজ বুদ্ধিবলে বুঝেছিলেন তৎকালীন এশিয়ার উদীয়মান সূর্য জাপান বেশিদিন ইংরেজের বন্ধু থাকবে না; বুঝতে পেরেছিলেন বিশ্বাসঘাতকের জাত ইংরেজ যুদ্ধের শেষে তার সহযোদ্ধা জাপান বা অনুগত কংগ্রেস কাউকেই করবে না সন্তুষ্ট। জাপানকে দেবে না যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বাণিজ্য সুবিধার ন্যায্য ভাগ আর কংগ্রেসকে দেওয়া শাসনসংস্কারের প্রতিশ্রুতিকেও করবে ভঙ্গ। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভূয়োদর্শী মানুষটি একথাও অনুধাবন করেছিলেন যে পরাজিত, পরাধীন আরেকটি দেশ চীনের তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শামিল হতে চাইবে অচিরেই। চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে প্রকৃত আন্তর্জাতিক রাসবিহারী তাই নিজের সংগঠনের অবশিষ্ট

*রাসবিহারী বসু*

অংশের দায়িত্ব শ্রীশচন্দ্র ঘোষকে দিয়ে নিজের কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন তৎকালীন এশিয়ার একমাত্র স্বাধীন দেশ জাপানকে এবং জাপানে পৌঁছবার কয়েক বছরের মধ্যেই বৈঠক করেন সান-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে। পরাধীন চীনের রাজনৈতিক মতবাদ তখনও কমিউনিজমের বিষবাষ্পের দ্বারা কলুষিত হয়নি বরং জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনতাং দল এবং সেই কুয়োমিনতাং দলের অবিসংবাদী নেতা সান-ইয়াৎ-সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিন্ন শত্রু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একযোগে সংগ্রাম করার পথ তিনি প্রশস্ত করেছিলেন। তৎকালীন ব্রিটিশ বন্ধু এবং ভারতে তাঁর পরিকল্পিত মহাবিপ্লবের একমাত্র সফল বাস্তব সিঙ্গাপুরের বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশদের সাহায্যকারী জাপান সরকার তাঁর এই প্রচেষ্টায় বাধা দান করবে বুঝতে পেরে জাপানের তৎকালীন বিরোধী দলনেতা মিৎসুরু তোয়ামার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আন্তর্জাতিক মানবচেতনার অভিজ্ঞ বিশ্লেষক রাসবিহারী বুঝেছিলেন স্বাধীনচেতা ও ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ অনুগামী জাপানিরা কখনওই মহাযুদ্ধের শেষে বঞ্চনাকারী ব্রিটিশের আজ্ঞাবাহী হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না। সেজন্য রাসবিহারী বিরোধী নেতার আশ্রয়ে থেকে (রাজনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই শাসক নেতার বিপরীত কাজে আগ্রহী, রাসবিহারীর বোধশক্তিতে ধরা পরেছিল তাও) অপেক্ষা করেছিলেন অনুকূল সময়ের। ভারতের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ও অনুধাবন করেছিলেন সেই সুদূর জাপান থেকেই। আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের এরকম নির্ভুল বিশ্লেষক এবং অনুধাবক এযুগে কেন সে যুগেও বিরল ছিল। তিনি বুঝেছিলেন মহাযুদ্ধের সমাপ্তিতে আশাভঙ্গের বেদনায় ও জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের আঘাতে মুহ্যমান ভারতবাসী গান্ধীজীর অধিনায়কত্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমেছে কিন্তু অহিংসার নীতিতে আস্থাশীল গান্ধীজী বা তাঁর অনুগামী নেতৃবৃন্দ তাঁর সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে সহায়তা করবে না কখনওই। তাই বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের প্রতি আস্থাশীল এবং তৎকালীন জাতীয় রাজনীতিতে কিছুটা কোণঠাসা লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুললেন। ভারত-জাপান-চীন এই তিন দেশের শক্তি তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। তার আগে এমনকী পরেও কোনোদিন এই ত্রিশক্তি মৈত্রী দেখেনি আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহল। এককালের রাষ্ট্রসঙ্ঘ বা বর্তমানের রাষ্ট্রপুঞ্জ কেউ যে অসাধ্য সাধন করতে পারেনি তা সাধিত করেছিলেন বিদেশে, পরগৃহে, ছদ্মবেশে, ছদ্মনামে লুক্কায়িত অবস্থায় থাকা রাসবিহারী। সান-ইয়াৎ-সেনের অকস্মাৎ মৃত্যুতে তাঁর স্বপ্ন বাস্তব রূপ পায়নি ঠিকই কিন্তু সেই

ব্যর্থতায় তিনি ভেঙে পড়েননি। কাজ নতুন করে শুরু করলেন তিনি। অবশ্য ব্যর্থতার সম্মুখীন তিনি আগেও হয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বাঘা যতীন, তিনি এবং আরও অনেক মহাবিপ্লবী মিলে জার্মানি থেকে অস্ত্র আনিয়ে এবং কাবুল থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ব্রিটিশ বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহী করে তুলে অমোঘ মহাবিপ্লবের যে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তাও ছিল আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে কালোত্তীর্ণ। কৃপাল সিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় সেই মহাপরিকল্পনা সাফল্যের মুখ দেখেনি কিন্তু ব্যর্থতার পরেও যে সাধনা ছাড়া উচিত নয়, ফল লাভের আশা না থাকলেও যে কর্মের পথ থেকে সরে যাওয়া উচিত নয় তা জ্ঞাত ছিল রাসবিহারীর।

*নেতাজী সুভাষ বসু*

তাঁর পরবর্তী প্রচেষ্টা তাই শুরু হয়েছিল ব্যর্থতার পর থেকেই। ততদিনে তাঁর ভাবনা মতো জাপান সরকার তার বিদেশনীতি পরিবর্তন করেছিল। তাঁর ইংরেজ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম তখন জাপান সরকারের সমর্থনধন্য। আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের অসামান্য ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা রাসবিহারী বুঝেছিলেন একটি মহাযুদ্ধে বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষমতাবিন্যাসের অন্তিম পর্যায় ঘোষিত হবে না। পরাজিত জার্মানি তার অপমানের বদলা নিতে ঘুরে দাঁড়াবেই আর বঞ্চিত জাপান তার ন্যায্য প্রাপ্যের জন্য সেদিন জার্মানির সঙ্গেই হাত মেলাবে। দুই জাগ্রত শক্তির মিলিত আক্রমণে টলবে ব্রিটিশ শক্তির সৌধ। তাই সেইদিন ভারতের স্বাধীনতার দাবিও যেন বিশ্বসংসারের সামনে উত্থাপন করা যায় এবং সেইজন্য তিনি সেদিন প্রস্তুত করেছিলেন নিজেকে এবং প্রবাসী ভারতীয় সমাজকে। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ গড়ে ভারতীয়দের দাবি তিনি ক্রমাগত তুলে ধরছিলেন জাপান সরকার ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের সরকারের সামনে আর একদিকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলছিলেন ভারতীয়দের লীগের ছত্রছায়ায়।

অবশেষে তাঁর কাঙ্ক্ষিত সময় এল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডঙ্কা বেজে উঠেছিল বিশ্বজুড়ে। জাপানের পশ্চিমমুখী আক্রমণ সেদিন ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করেছিল। সেদিন জাপানের হাতে বন্দি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সেনাদের নিয়ে আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ গড়ে তুললেন রাসবিহারী।

এর পরেই দেখা গেল তাঁর জীবনের মহত্তম আত্মত্যাগ। নিজের শরীরের অবস্থা খারাপ হচ্ছে বুঝতে পেরে এবং আন্তর্জাতিক রণনীতিতে সৃষ্ট নতুন সমীকরণে সুভাষচন্দ্রের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরে, তাঁকে ডেকে পাঠালেন আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করার জন্য। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তুলতে তিনি চিঠি পাঠালেন বীর সাভারকরকে। কংগ্রেস সভাপতির পদবিচ্যুত সুভাষচন্দ্র তখন জাতীয় রাজনীতিতে কোণঠাসা। বীর সাভারকর রাসবিহারীর আহ্বান তাঁর নিকটে পৌঁছে দিলেন।

অবশেষে সুভাষচন্দ্র ভার নিলেন আজাদ-হিন্দ-ফৌজের। তিনি হলেন সর্বাধিনায়ক। শুরু হলো স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন এক অধ্যায়ের। কিন্তু এর মধ্যে ইতিহাসের আরেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লুকিয়ে আছে যা আন্তর্জাতিকতায় আস্থাশীল সকলেরই অবশ্য শিক্ষণীয়। ১৯৩৯-এ যুদ্ধ শুরু থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত জাপানি সেনারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পরাজিত বাসিন্দাদের সম্পত্তি ক্রোক, পুরুষদের যুদ্ধবন্দি হিসেবে শ্রমসাধ্য কাজে নিয়োগ এবং মেয়েদের যুদ্ধ প্রয়োজনে বন্দি করেছিল। পূর্বের ব্রিটিশ শাসিত এই দেশগুলিতে বসবাসরত ব্রিটিশরা, অন্যান্য ইউরোপীয়রা এবং সেই দেশগুলির আদি বাসিন্দারা কেউই এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। শুধুমাত্র মহানায়ক রাসবিহারী বসুর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় রক্ষা পেয়েছিলেন সেখানে অবস্থিত প্রবাসী ভারতীয়রা। জাপানি সেনাবাহিনী তাদের যুদ্ধবন্দি হিসেবে দেখেনি বরং রাসবিহারীর প্রচেষ্টায় জাপান সরকারের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী তারা অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করেছিল ভারতীয়দের সঙ্গে। এমনকী কে ভারতীয়, কে ভারতীয় নয় তা বোঝার জন্য নৃতত্ত্বের বইও বিতরণ করা হয়েছিল জাপ সেনাবাহিনীর ভেতরে।

তুলনাটা এখানেই মনে ভেসে ওঠে, তফাতটা এখানেই চোখে পড়ে। আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে এবিপি আনন্দের দপ্তর পর্যন্ত বা

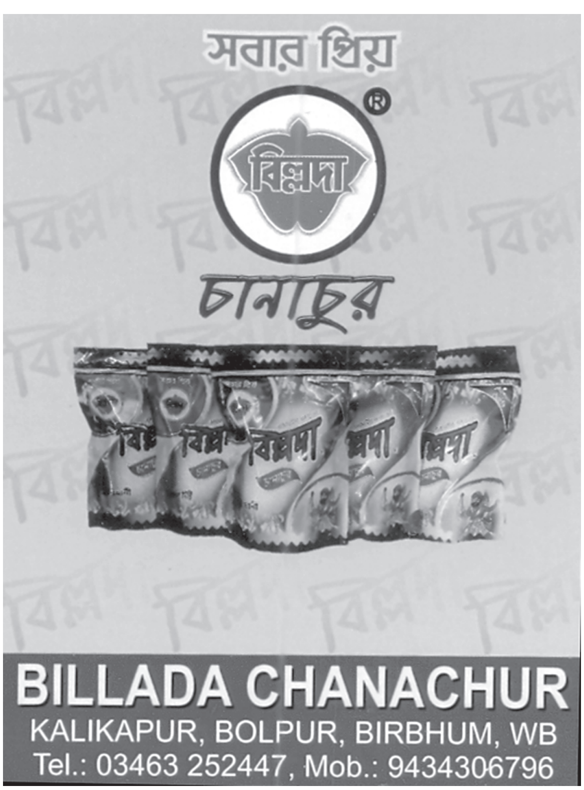

কালীঘাট থেকে নবান্ন পর্যন্ত বিচরণকারী আজকের আন্তর্জাতিকতাবাদী বুদ্ধিজীবীরা দেশের অন্ন ধ্বংস করে বিদেশের ভালো চাওয়াকেই আন্তর্জাতিকতা মনে করে। প্রকৃত আন্তর্জাতিক রাসবিহারী যেখানে প্রয়োজনে বিদেশে থেকে এবং বিদেশির সাহায্য নিয়ে নিজের দেশের উপকার করাকেই মনে করতেন প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা। লাতিন আমেরিকা থেকে মধ্যপ্রাচ্য, পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে সংঘটিত যে-কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হওয়া অথচ কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিত বা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় মুখ বুজে থাকা আজকের আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবীদের পাশে হঠাৎই মনে পড়ে যায় অন্যান্য দেশের যুদ্ধবন্দিদের কথা অহেতুক চিন্তা না করে ঠাণ্ডা মাথায় ভারতীয়দের বাঁচানোর পরিকল্পনাকারী প্রকৃত আন্তর্জাতিক রাসবিহারীর কথা।

সমগ্র পৃথিবীকে আলোকপ্রদানকারী সূর্যও অস্ত যায়। রাসবিহারীর মতো মহাবিপ্লবীও জীবন ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বেই রাসবিহারী বসুকে জাপানের শ্রেষ্ঠতম সম্মান 'Second order of the Merit of the Rising Sun' প্রদান করেছিল জাপান সরকার। তাঁর শেষকৃত্যে সভাপতিত্ব করেছিলেন জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কোকি হিরোতা। উপস্থিত ছিলেন জাপানের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান তোজো স্বয়ং এবং তাঁর মৃতদেহ বাহিত হয়েছিল জাপান রাজপরিবারের জন্য নির্দিষ্ট রাজকীয় শবাধারে।

*বীর সাভারকর*

বিদেশের মাটিতে এত সম্মানিত রাসবিহারী বসু কিন্তু মৃত্যুকালে নির্নিমেষে চেয়েছিলেন চোখের সামনে দেওয়ালে খচিত 'বন্দে মাতরম্' কথাটির দিকে। মৃত্যুর আগে জাপানে এই সম্মানিত জীবন কাটানোর সময় রাসবিহারী প্রত্যেক দিন নিজের বাড়ির বাগানে একটি ওক্ কাঠের ফলকের সামনে বসে সান্ধ্য উপাসনা করতেন। সে ফলকে লেখা ছিল তাঁর সহ-বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র ঘোষ-সহ আরও অনেক ভারতীয় বিপ্লবীর নাম। অন্তিমেও যেন রাসবিহারীর জীবন শিক্ষা প্রদান করে সেই সব মেকি আন্তর্জাতিকতাবাদীদের যারা দেশে সম্মান, বৃত্তি সব লাভ করেও বিদেশে গিয়ে অথবা এদেশে থেকেও নিজের দেশের নিন্দা করে আর বিদেশ থেকে কোনো সামান্য সম্মান লাভ করলে ভারতের ঘোষিত শত্রু এবং বিদেশের পদলেহী সারমেয়ে পরিণত হয়। আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে তাই আমাদের ঠিক করতে হবে কোন ধরনের আন্তর্জাতিক দেশসেবক আমাদের দরকার— মহানায়ক রাসবিহারী বসুর মতো না কৃপাল সিংহের সার্থক উত্তরসূরী বিদেশমুখী একালের তথাকথিত আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবীদের মতো।

*(রাসবিহারী বসুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত)*


১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০্ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০্টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬, দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

# স্বীকৃতি ও নামকরণের পটভূমিতে উত্তরবঙ্গের ভাষা

সুখবিলাস বর্মা

সাম্প্রতিক কালে কামরূপী কথ্য ভাষার স্বীকৃতি ও নামকরণের প্রশ্নে শুরু হয়েছে চাপান-উতোর, সেইসঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। চলছে তর্ক-বিতর্ক-প্রতর্ক এবং উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করার অপপ্রয়াস। এক অবিশ্বাসের কালো মেঘ ক্রমশ উত্তরের আকাশ ছেয়ে ফেলতে শুরু করেছে। চতুর্দিকে নতুন করে এক অস্থিরতার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এই এলাকায় নতুন কোনো অশান্তি ডেকে আনবে না তো? স্বীকৃতি ও নামকরণের পূর্বে বিষয়টি একটু ভালো করে ভাবা দরকার। সেই সঙ্গে এই বিষয়াদি অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের ভাষা ও উপভাষা কথ্য ভাষা বিষয়টি যত বেশি সম্ভব সাধারণ্যে পৌঁছানো এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি।

আলোচ্য বিষয় হলো উত্তরবঙ্গে ভাষা ও উপভাষা কথ্য ভাষা। আলোচ্য বিষয়টির নামকরণের মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে এক বিতর্কের— উত্তরবঙ্গের ছ'টি জেলায় কথ্য ভাষা হিসেবে যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয় তা ভাষা, না উপভাষা। তার আগে প্রশ্ন ওঠে, উত্তরবঙ্গের সব জেলার কথ্য ভাষা এক কিনা? উত্তরবঙ্গের পাহাড় এলাকার কথা ছেড়ে দিয়েই এ প্রশ্ন রাখছি। সম্ভবত নয়। সব জেলার কথ্য ভাষার রূপ এক নয়। এর কারণ খুঁজতে হলে আমাদের তাকাতে হবে এই সমগ্র অঞ্চলটির ইতিহাসপটের দিকে। ঐতিহাসিক ভাবে, এই অঞ্চলের পূর্বাংশ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলা, দার্জিলিঙের কিছু অংশ ছিল প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত; দিনাজপুর (বর্তমান উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর-সহ) ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত; অন্যদিকে মালদা গৌড় অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এলাকাভিত্তিক পার্থক্য ও বিশিষ্টতা ছিল এবং এখনো রয়েছে। তবে একথা সত্যি যে, এলাকাভিত্তিক কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও একটা মূল ভাষাধারা সমগ্র অঞ্চলব্যাপী রয়েছে— যেহেতু সমগ্র অঞ্চলে একটি ভাষাগোষ্ঠীই (যার নাম রাজবংশী) অঞ্চলের জনসংখ্যার বৃহদংশ। আবার এই ভাষাগোষ্ঠীর প্রাধান্য ও আধিপত্যের মূল জনপদ কামরূপ। কামরূপের ইতিহাস পাওয়া যায় মোটামুটি চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকে। ভাস্কর বর্মা, হিউয়েন সাঙের কামরূপ ভ্রমণ, রামপালের রাজত্বকাল, নরনারায়ণ, চিলা রায়ের কামরূপ রাজ্য বিস্তৃতি ইত্যাদি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী। তাই কামরূপ অঞ্চলের (অর্থাৎ বর্তমান অসমের কামরূপ, ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া জেলা, পশ্চিমবাংলার কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চল, বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া জেলা) ভাষা ও ভাষাগোষ্ঠী শুধু কামরূপ নয়— তৎপার্শ্ববর্তী এলাকাতেও প্রভাব বিস্তার করেছে। উত্তরবঙ্গের ভাষা বলতে তাই সম্ভবত এই কামরূপী ভাষাকেই বোঝানো হয়েছে। এই কামরূপী ভাষা, রাজবংশী ভাষা নামে পরিচিত। প্রধানত যে গোষ্ঠীর মানুষ এই ভাষা ব্যবহার করেন সেই গোষ্ঠীর নামে নামকরণের প্রবণতা থেকে এই ভাষাকে রাজবংশী নাম দেওয়া হয়েছে। কামরূপী, না রাজবংশী— কোন্ নামটি বেশি উপযোগী? গ্রায়ারসন এবং তাঁকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা, উপেন্দ্রনাথ বর্মণ, কলীন্দ্রনাথ বর্মণ, হেমন্ত রায় বর্মা প্রমুখ লেখক-গবেষক এ বিষয়ে সাধারণভাবে রাজবংশী নামেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। অন্যদিকে, ভাষাতাত্ত্বিকগণ কামরূপী নামের উপর বেশি জোর দিয়েছেন— এঁদের মধ্যে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন, ড. নির্মল দাশ, ড. সত্যেন বর্মণ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কখনো কখনো পঞ্চানন বর্মাও কামরূপী নাম উল্লেখ করেছেন। এই দুটি নাম ছাড়াও কখনো কখনো কোনো লেখক-গবেষক এই ভাষাকে 'কামতাবিহারী' ভাষা আখ্যা দিয়েছেন। এ বিষয়ে রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবিশ প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। এই 'কামতাবিহারী' নামটিকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিককালে প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের একচ্ছত্র নেতা রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নিতান্ত সাধারণ

পঞ্চানন বর্মা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

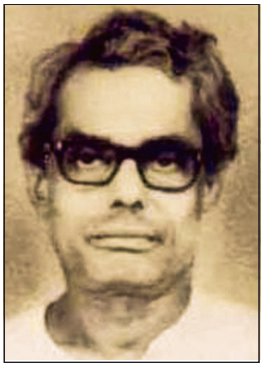
সুকুমার সেন

ভাবে কামতাবিহারী সাহিত্যের উল্লেখ ও আলোচনা করেন। সাধারণভাবে বলছি এই কারণে যে, তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে কোনো যুক্তিপূর্ণ ইতিহাসসিদ্ধ তথ্য নেই। এটি হাল্কা মেজাজে লেখা একটি প্রবন্ধ মাত্র।

'পূর্বে রাজা বন্দি গাঙ্গো ভানু ভাসাঙ্কর,
উত্তরে কালিকা বন্দোং দক্ষিণে সাগর।
পশ্চিমে...পাথর মেলে চির।'

এই বন্দনা গানটির উল্লেখ করে তিনি বলেছেন— 'বন্দনাটি সুতরাং বিজয়মণ্ডিত কামতাবিহারের বন্দনা বা মল্লরায়ের রাজত্বে কামতাবিহারীর জয়োল্লাস।' আবার বলেছেন— 'বিশ্বসিংহ শাসিত দেশটাই কামতাবিহার। যোগনীতন্ত্রে বিশ্বসিংহের উল্লেখ আছে। তাঁহার রাজ্য বিষয়ে বর্ণনা আছে। তাঁহার রাজ্য কামরূপ দেশ। সেই কামরূপ দেশের চতুঃসীমা বর্ণনা করা হইয়াছে।... এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী দেশটি মোটামুটি কামতা দেশ বলিয়া বলিতে পারি'।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কামরূপ ও কামতার সীমারেখা কি এক? মহারাজ নরনারায়ণের সময়ের কামরূপের যে বিস্তৃতি ছিল সে তুলনায় কামতাবিহার বা কামতা— মূলত কোচবিহার জেলা ও রংপুর জেলার ঘোড়াঘাট অঞ্চল ছিল নিতান্তই ক্ষুদ্র একটি রাজ্য। এই বিস্তৃত জনপদের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে কোনো বড় শাসনকর্তার অভাবে কিছু কিছু প্রাদেশিক শাসনকর্তার উদ্ভব হয়। বাংলায় ওই সময়ে বারো ভুঁইঞার শাসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। বারো ভুঁইঞার মধ্য থেকে দুর্লভনারায়ণের নাম পাওয়া যায় কামতার শাসনকর্তা হিসাবে। কিন্তু কামতাপুর রাজ্য বলতে সাধারণত যা বোঝায় তা হলো খ্যান্ বংশের নীলধ্বজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্য, যাদের শাসন সেই বংশের তৃতীয় পুরুষ নীলাম্বরের আমলেই শেষ হয়ে যায় ১৪৯৮ সালে। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল গোসানিমারি— রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সীমারেখা দুই-ই 'কামরূপ দেশ' এর তুলনায় অতি নগণ্য। এবং সেই কারণেই গোবিন্দ মিশ্রের গীতা প্রসঙ্গে পঞ্চানন বর্মা বলেছেন— 'পুঁথিখানির ভাষা কামরূপী বটে কিন্তু কামতাবিহারী বা কুচবিহারী ভাষার প্রভাব অধিক। এমনকী দুই চারি স্থানে কিছু পরিবর্তন করিলে পুঁথিখানির ভাষা পূর্ণমাত্রায় কামতাবিহারী হইয়া উঠে।'

তাঁর বক্তব্য খুব পরিষ্কার। কামতাবিহারী বলতে তিনি কুচবিহারী অর্থাৎ শুধুমাত্র কোচবিহার অঞ্চলের কথ্য ভাষাকে বোঝাতে চেয়েছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কামরূপী বা রাজবংশী ভাষার শব্দ, ধ্বনি ও উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য এলাকার সব অঞ্চলে এক নয়। গোয়ালপাড়া, রংপুর, কোচবিহারে ব্যবহৃত ক্রিয়ারূপ এবং জলপাইগুড়ি, তরাই বা দিনাজপুরে ব্যবহৃত ক্রিয়ারূপ সব সময়ে এক নয়। উচ্চারণ পার্থক্য তো রয়েছেই। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা কোচবিহার অঞ্চলে কামরূপীর কথ্য রূপকে কামতাবিহারী আখ্যা দিতে চেয়েছেন। অর্থাৎ কামরূপী যদি ভাষা হয়, কামতাবিহারী নিশ্চিতরূপেই তবে উপভাষা— কারণ কামরূপ অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত কোচবিহার উপ-অঞ্চলের ভাষা এই কামতাবিহারী।

কামতাবিহারী ভাষা নিয়ে দাবি করতে গিয়ে কোনো কোনো লেখক-গবেষক এত সব বিচার করার চেষ্টা না করে রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা যে কথাটি ব্যবহার করেছেন শুধুমাত্র সেই সূত্র ধরে অবৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করার প্রয়াস দেখান। শুধু তাই নয়, কামতাবিহারীকে কামতাপুরের সমার্থক দেখিয়ে তাঁরা বিষয়টিকে আরও জটিল করেন। তাঁরা ভুলে যান— কামতাবিহার বলতে সমগ্র উত্তরবঙ্গকে বোঝায় না এবং উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা নিজেদের কামতাবিহারী বলার চেয়ে কামরূপী বলতে অনেক বেশি গৌরব বোধ করেন— কারণ কামরূপের সঙ্গে যে গৌরব জড়িত তার অংশমাত্রও কামতায় নেই। শুধু তাই নয়, কামতার রাজারা নিজেদের রাজবংশী গোষ্ঠীভুক্ত মনে করেন না। খ্যান্ বংশের এই রাজারা নিজেদের কায়স্থ হিসেবেই দাবি করেন।

উল্লেখ করেছি যে, কামরূপী ভাষা হলেও তথাকথিত কামতাবিহারী নিশ্চিত রূপেই উপভাষা। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, কামরূপী বা রাজবংশী ভাষা, না উপভাষা। এই ভাষা নিয়ে যিনি প্রথম বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেন সেই গ্রীয়ারসন রাজবংশীকে উপভাষা আখ্যা দিয়েছেন। ভাষাতত্ত্বের নিরিখে বিচার করলে অন্য সব আঞ্চলিক ভাষার মতো এটি নিশ্চিতরূপেই ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর একটি উপভাষা। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের ও ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম না মেনে হালকাভাবে একে উপভাষা, বিভাষা ইত্যাদি না বলে ভাষাই বলা হয়। এ প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করবো একটি ভাষা থেকে বিভিন্ন উপভাষার যে সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে বিখ্যাত পণ্ডিতদের মত। ভাষাতাত্ত্বিক Otto Jasperon এর মতে উপভাষার জন্মের কারণ— 'not purely physical but want of communication for whatever reason'...C.F. Hocket এ বিষয়ে একমত। তাঁর মতে, ভাষার রূপ ও ধ্বনিগত একরূপতার মূলে বাচকগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সান্নিধ্য ও সংযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Leonard Bloomfield-এর অভিমত 'It is contained that under wider conditions a new political boundary led in less that fifty years to some linguistic differences.'

পণ্ডিতদের এই কথাগুলি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। তাঁদের এই কথাগুলি থেকে সহজেই বোঝা যায় কী করে বাংলায় বিভিন্ন উপভাষার সৃষ্টি হয়েছে। সিলেট, চট্টগ্রামের কথ্য ভাষার সঙ্গে রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া বা কোচবিহার, জলপাইগুড়ির কথ্যভাষার মাতৃরূপ যে এক অর্থাৎ Indo-Aryan-এর একটি শাখা যা বাংলা নামে পরিচিত হয়েছে— সে বিষয়েও সম্যক ধারণা জন্মায়। তা যদি না হতো তবে দেশ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ববঙ্গের ওইসব জেলা থেকে আগত উদ্বাস্তুরা কিছুতেই এই অঞ্চলের ভাষাভাষীদের সঙ্গে অত সহজে ভাববিনিময় করতে পারতেন না এবং অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে এখানকার ভাষা-সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করতে পারতেন না।

কামরূপী বা রাজবংশী ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? এখানে বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই--- তবুও

আলোচনার গতি রক্ষার্থে সংক্ষেপে সেগুলির উল্লেখ প্রয়োজন। নিবিড়ভাবে বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলিয়ান নৃ-গোষ্ঠীর মিশ্রণে উদ্ভূত নরগোষ্ঠীর রাজবংশীরা আর্যীকরণের সম্মুখীন হয়ে গ্রহণ-বর্জনের ধারায় কালক্রমে তাদের পূর্বতন ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করে আর্যসুলভ ধর্ম, আচার, বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করেছে এবং ভাষার দিক থেকে পূর্বতন ভাষার পরিবর্তে ভারতীয় আর্যভাষাকে গ্রহণ করেছে এবং সেটা ঘটেছে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই। ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে, আর্যভাষার তৃতীয় স্তরের ভাষা মাগধী অপভ্রংশ রাজবংশী নৃগোষ্ঠীর ব্যবহারে ধ্বনিগত ও রূপগত দিক থেকে স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে একটি আঞ্চলিক রূপ লাভ করেছে।

এই ভাষায় ভারতীয় আর্যের অপেক্ষাকৃত কিছু প্রাচীন বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ মধ্য বাংলার কিছু লক্ষণ এখনো বিদ্যমান সে বিষয়েও ভাষাতাত্ত্বিকরা একমত। শিষ্ট চলিত বাংলার সঙ্গে এই ভাষার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়— (১) ধ্বনি, (২) রূপ, (৩) পদবিন্যাস ও (৪) শব্দসম্ভারের দিক থেকে। ভারতীয় আর্যভাষার দরবারে এই ভাষার গুরুত্ব কত সে বিষয়ে এই ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে যিনি প্রভূত গবেষণামূলক কাজ করেছেন সেই ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে— প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার সঙ্গে এই উপভাষার যোগাযোগ বেশ ঘনিষ্ঠ। তাঁর মতে, এই উপভাষার মাধ্যমেই বাংলা ভাষার ইতিহাস ও গতি পরিবর্তনের স্তরগুলিকে স্পষ্টরূপে অনুধাবন করা যায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাজবংশী বা কামরূপী ভাষার উৎপত্তি কোথা থেকে সে বিষয়ে কোনো কোনো গবেষক ভিন্নমত পোষণ করেন। যেমন স্বর্গীয় হেমন্ত কুমার রায় বর্মার যুক্তি, এই ভাষাটির উদ্ভব সরাসরি সংস্কৃত থেকে। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ধমনীতে কত পরিমাণ আর্য রক্ত প্রবাহিত সেটা প্রমাণ করতে গিয়েই তিনি এই প্রয়াস দেখিয়েছেন। আবার অন্যদিকে, সাম্প্রতিককালে শ্রীধর্মনারায়ণ বর্মার যুক্তি, কামরূপী (তাঁর মতে কামতাবিহারি বা কামতাপুরী) ভাষার উৎপত্তি মৈথিলী থেকে। উভয়ের যুক্তির সম্ভার কিছু শব্দ, ক্রিয়াপদ ইত্যাদির ব্যবহার। শুধুমাত্র কয়েকটি শব্দ দুই ভাষাতেই এক অর্থাৎ শব্দসাম্য কোনো ভাষার উৎপত্তি নির্দেশ করে না। তাই যদি হোত তবে তো কামরূপী ও মারাঠী ভাষা একই শ্রেণীর। কামরূপী 'কোটে', 'কোন্টে' অর্থাৎ কোথায়, মারাঠীতেও 'কুঠে'? তেমনি কামরূপীর 'মোর' মারাঠীতেও 'মোর'।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে কামতাবিহারী ভাষা সম্পর্কে এ ধরনের কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্য ও সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে কামতাবিহারী ভাষা ও কামতাবিহারীকে একটা পৃথক entity (সত্তা) দেওয়ার চেষ্টার মাধ্যমে কিছু মানুষকে, বিশেষ করে ছাত্র যুবককে ভুল পথের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা এই চেষ্টা করেছেন তাঁরা একবারও ভাবছেন না যে, সমস্ত ব্যাপারটিতে যুক্তির চেয়ে আত্মগরিমা (ego) ও ভাবপ্রবণতা (emotions) প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রধানত ভাবপ্রবণতার দ্বারা চালিত বলেই তাঁরা কামতাবিহারী সাহিত্যের যে নমুনা প্রদর্শন করেন তাতে কিছু কিছু শব্দ ও ক্রিয়া কামরূপী থেকে নেওয়া হলেও তার বেশিরভাগই যে শিষ্ট বাংলার রূপ সেটা বেমালুম ভুলে যান। এমনকী রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা কামতাবিহারী সাহিত্য নামে যে সাহিত্যের উল্লেখ করেছেন সেগুলোর অধিকাংশই যে শিষ্ট বাংলা সেকথা তাঁরা বিচার করে দেখতে চান না। রায়সাহেব কর্তৃক 'কামতাবিহারী' এই শব্দটির উল্লেখকেই তাঁরা প্রধান অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। শুধু তাই নয়, যে মানসিকতা ও ভাবপ্রবণতার প্রভাবে আবিষ্ট হয়ে তাঁরা তথাকথিত কামতাবিহারী সাহিত্য থেকে কামতাবিহারী ভাষা ও রাজ্যের দাবি করেন সেই সাহিত্যিক-লেখকদের পরিচয় কী সে ব্যাপারে চিন্তা করেন না। শঙ্করদেব, মাধবদেব, পীতাম্বর, শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ, দামোদরদেব, গোবিন্দ মিশ্র প্রমুখ কেউই রাজবংশী গোষ্ঠীভুক্ত নন। তাই তাঁদের ভাষায় কামরূপী প্রভাব তেমন নেই— তাঁদের সাহিত্যে হয় অসমীয়া, নয় তো বাংলার প্রভাব বেশি, যদিও কামরূপী অর্থাৎ রাজ্যের lingua franca থেকে সামান্য কিছু শব্দ ও ক্রিয়ার প্রয়োগ তাঁরা করেছেন। এই সাহিত্যের বিষয়গুলিও উল্লেখ করার মতো— ধর্ম, পুরাণ, মহাভারত, গীতা, রাজার গৌরবগীতি ইত্যাদি। এতে কামরূপবাসী সাধারণ্যের মর্মবাণী কোথায়? এই সাহিত্যসম্ভার নিয়ে আমাদের রাজবংশীদের গৌরব করার কিছু আছে কিনা বিচার করা উচিত, উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে।

আমার এই বক্তব্য কত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ সেটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যদি আমরা আলোচিত এই সাহিত্যসম্ভারের সঙ্গে রাজবংশী গোষ্ঠীভুক্ত কবি-সাহিত্যিক-গীতিকারদের সাহিত্যসম্ভারের তুলনা করি— ভাষা ও বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকেই। কামরূপী ভাষার প্রয়োগ-সহ রায়সাহেবের নিজের লেখা কবিতা-প্রবন্ধগুলি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কারো চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন নেই যে, পঞ্চানন বর্মা রচিত আত্মগরিমা কবিতাগুলি ভাষা ও বিষয়ের দিক থেকে অনেক বেশি কামরূপী ধর্মী। অন্যদের উল্লিখিত রচনা তৎকালীন বাংলা ছাড়া অন্য কিছু নয় এবং সেগুলি মূলত অভিজাত শ্রেণীর প্রভাব ও প্রয়োজনে লিখিত। কামরূপী সাহিত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পেতে হলে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে— পঞ্চানন বর্মার লেখা 'ডাংধরী মাও' কবিতা, তাঁর প্রবন্ধ 'নাদিম পরামাণিকের পাঁঠা', 'জগন্নাথী বিলাই' প্রভৃতি ছাড়াও গোপীচন্দ্রের গান, রতিরাম দাস রচিত জাগগান এবং কামরূপ অঞ্চলের ভাওয়াইয়া-চটকা গানের দিকে—বিশেষ করে রতিরাম দাসের রচনার দিকে।

পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে রতিরাম দাসের জাগগানের কিছু নমুনা পেশ করছি।

(১)

খুঁরিয়া বতুয়া শাকে ক্ষেত গেইছে ভরি।  
রাধা যায় শাক তুলতে নয়া ডালি ধরি।।  
সরু কাপড়া পরছে রাধা কেবল নয়া ধোপ।  
নচ্‌পচা শাক দেখি রাধার হইল নোভ।।

(২)

এই সীমার মাঝে দেশ পোণাদুয়ার থিতি।
এ দেশে আমাদের জাতির বসতি।।
হায়রে রাজার বংশে লভিয়া জনম।
পরশুরামের ভয় এ বড় শরম।।
রণে ভঙ্গ দিয়া মোরা এ দেশে আইসাছি।
ভঙ্গ ক্ষত্রি রাজবংশী এই নামে আছি।।

রতিরামের কবিত্বশক্তি ও শব্দযোজনার উৎকৃষ্ট রূপ পাই ত্রিপদী ছন্দে রাজবংশী নায়ক ও নায়িকার রূপ বর্ণনায়। নায়কের শালপ্রাংশু সবল বাহুর বর্ণনা—

মোটা মোটা তার হাত দুই খানি
নোহা দিয়া জেন গড়া।
ড্যানা দুখানি নোহার মতন
হাড়ে মাংসে রগে জড়া।
সিদা যদি করে বাইমের মতন
মাঝেতে মাঝেতে ফুলে।
জোরেতে নগুলে টিপা যদি যায়
খালি নাহি পড়ে মূলে।

তেমনি নায়িকার বর্ণনা—

একদিগে চুঁচি আর দিকে পাছা
দু'জনে লইল টানি।
আছে কি না আছ বুঝা নাহি যায়
আমার কমোর খানি।
একদিকে যেমন মন্থনা লইল
অন্যদিকে বামনডাঙ্গা।
ফতেপুর এখন আছে কিনা আছে
সব দিক হইছে ভাঙ্গা।

কী অপূর্ব কবিত্ব, কল্পনা ও উপমা।

কারও কাছে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই যে, রায়সাহেব উদ্ধৃত শঙ্কর দেও, দামোদর দেও, পীতাম্বর, গোবিন্দ মিশ্রের কবিতার চেয়ে অনেক বেশি কবিত্বগুণসম্পন্ন ও কামরূপধর্মী তাঁর নিজের রচিত সাহিত্য এবং রতিরাম দাস প্রমুখ রচিত সাহিত্য। আগেই উল্লেখ করেছি, তথাকথিত কামতাবিহারী সাহিত্যের সিংহভাগটাই তৎকালীন বাংলা সাহিত্য ছাড়া আর কিছু নয়। অধিকন্তু পঞ্চানন বর্মার কাছে কামরূপী (কামতাবিহারী) ও বাংলা ভাষার মধ্যে সেই অর্থে তেমন কোনো পার্থক্য অনুভূত হয়নি। বাংলা ভাষা তাঁর কাছে এত প্রিয় ছিল যে রংপুরে সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপন করে বাংলা ভাষা সাহিত্যের চর্চার জন্য তাঁরা রংপুরে সাহিত্য পরিষদ স্থাপন করেন এবং সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রের সম্পাদক হিসেবে তিনি কাজ করেন। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে তিনি ওই পত্রিকায় উত্তরবঙ্গের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সঙ্গীত, নৃত্য, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিশদভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হন। কামরূপীকে বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত উপভাষা মনে না করলে তিনি কখনোই এ কাজে এগিয়ে আসতেন না। নিজের আদর্শ ও লক্ষ্য পূরণ করার জন্য তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, কঠোর মনোভাব, অদম্য উদ্যম ও উৎসাহ ক্ষত্রিয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করেছি। কামরূপীকে বাংলা ভাষা থেকে আলাদা করে দেখতে চাইলে তিনি কামরূপীকে বাংলা ভাষা সাহিত্যের চর্চা না করে এককভাবে শুধু কামরূপী সাহিত্যচর্চাতেই নিজেকে নিয়োজিত করতেন।

বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও সমর্থন ছিল বলেই তিনি ক্ষত্রিয় সমিতির বক্তৃতাও দিতেন বাংলাতে। তিনি কামরূপী ভাষা বলা ও লেখাতে পারদর্শী ছিলেন। তা সত্ত্বেও এমনকী নিজের সামাজিকদের প্রতি ভাষণে তিনি বাংলাই ব্যবহার করতেন। ক্ষত্রিয় সমিতির বার্ষিক অধিবেশন তাঁর বক্তৃতার নমুনা—

*"আমরা এখন সকলের হেয় হইয়া পড়িয়াছি। ইহার প্রধান কারণ আমাদের শিক্ষার অভাব। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে আমরা আমাদের ভালোমন্দ সঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না।...অর্থাৎ শিক্ষার অভাবেই আমরা আমাদের বিচার যুক্তি হারাইয়াছি। পরের তিরস্কারের ভাজন হইয়াছি।...* দ্বার্থহীন ভাষায় তিনি বলেছেন— *কেবল ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিলে সমাজের সংস্কার হইল না। উল্লিখিত আচারগুলি আভ্যন্তরিক কতকগুলি গুণের নিদর্শন মাত্র। যাবৎ সেই গুণগুলি আয়ত্ত করিতে না পারি তাবৎ আমরা ক্ষত্রিয়পদের প্রকৃত উপযুক্ত নই।...* তিনি আরও বলেছেন— *শিক্ষা ভিন্ন এই সদগুণগুলির নির্ধারণ ও লাভ ঘটিয়া উঠিবে না। সংসারে শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার জন্য ধন সঞ্চয় আবশ্যক। অর্থের আগমনের জন্য আমাদের বিদ্যাশিক্ষা কর্তব্য। কৃষি আমাদিগকে পালন করিতেছি। কৃষি আমরা ছাড়িব না।*

আমার এই বক্তব্যগুলি সবার জানা। বিশেষ করে আমাদের রাজবংশী সমাজের যাঁরা এখানকার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি নিয়ে চর্চা করেন তাঁরা সকলেই এই তথ্যগুলো সম্পর্কে অবগত। তথাপি তাঁদের অনেকের মধ্যে অন্য সুর, অন্য মনোভাব দেখা যায় কেন? অনেক কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ উত্তরবঙ্গে অবহেলিত, অর্ধশিক্ষিত, নিরক্ষর, দুঃস্থ রাজবংশীদের প্রতি কিছু তথাকথিত পণ্ডিত-গবেষকদের মনোভাব এবং তাঁদের সেই মনোভাবের প্রকাশভঙ্গি এর জন্য অনেকটাই দায়ী। একহাতে তালি বাজে না। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের প্রতি আজও কিছু মানুষের বিশেষ করে কিছু পণ্ডিত-গবেষকের মনোভাব ও মন্তব্য সময়ে সময়ে তিক্ততা ও অশান্তির সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে শুধুমাত্র 'বাহে' শব্দটি দীর্ঘকাল ধরে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে বিভিন্ন সময়ে কী আলোড়ন ও অশান্তি সৃষ্টি করেছে যে সম্পর্কে আমার পুস্তক 'জাগ গান'-এ আলোচনা করা হয়েছে। 'বাহে' শব্দটির অর্থ বাবা হে অর্থাৎ এটি একটি সম্বোধনসূচক শব্দ। রাজবংশীরা পুত্রস্থানীয়-পিতৃস্থানীয়দের সম্বোধন করার জন্য এই 'বাহে' কথাটা ব্যবহার করেন। কিন্তু রাজংবশী সমাজের বাইরের, বিশেষ করে অর্ধশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই গরিব রাজবংশীদের তুচ্ছার্থে 'বাহে' আখ্যা দেন এবং তাঁদের ব্যবহৃত ভাষাকে 'বাহে' ভাষা বলেন। দুঃখের বিষয় যে, রাজবংশী ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে অত্যন্ত প্রগাঢ় ভাবে মিশে যাওয়া ব্যক্তিও অনেক সময়ে রাজবংশী সমাজের মানুষকে এভাবে আঘাত দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। এই মনোভাব লক্ষ্য করা যায় বিশেষ করে ধনী অর্ধশিক্ষিত চাকুরে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। তাদের সেই অনুভূতিতে, ego-তে, সুড়সুড়ি দিয়ে বিপথে চালিত করাও খুব সহজ— বিশেষ করে যদি তেমন কোনো স্ফুলিঙ্গ তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আমি যতদূর জানি উত্তরবঙ্গের কোথাও

কোথাও আজ যে আওয়াজ তোলার চেষ্টা চলছে— রাজবংশীরা বাঙালি নয়, কামরূপী বা রাজবংশী ভাষা বাংলা নয়, সেজন্য অনেকটাই দায়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯১১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' গ্রন্থের আট ও তেইশ পৃষ্ঠায় বাহে ও রাজবংশীরা বাঙালি নন এই মন্তব্যগুলো নিয়ে আমরা যখন প্রতিবাদ সংগঠিত করছি, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ সংগঠিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরে আনার কাজ চলছে— সেই সময় এই অঞ্চলের কিছু বিভেদ সৃষ্টিকামী বুদ্ধিজীবী 'রাজবংশীরা বাঙালি নয়' এই মন্তব্যের সুযোগকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। এরকম কিছু মানুষের নেতৃত্বে উসকিয়ে দেওয়া আগুনকে আজ আরও কিছু মানুষ চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

আমি শুধু তাঁদের সুবুদ্ধি ও বিচারবোধের কাছে প্রার্থনা জানাবো— তাঁরা একবার ভেবে দেখুন— আমরা কী চাই, কেন চাই এবং যা চাই তা কি চাওয়ার বস্তু, আর যদি তাই হয় তা লাভ করতে গঠনমূলক কোনো পন্থা আছে কিনা, যাতে আমরা সকলের সমর্থন পাবো— সমাজের সকলের মঙ্গল হবে। অনেকেরই জানা আছে 'আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান'-এর ক্ষেত্রে আমাদের সর্বস্তরের প্রতিবাদের ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভুল স্বীকার করে নিয়েছিল। ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, অভিধানটির পরবর্তী সংস্করণে তাঁরা এই ভুল সংশোধন করবেন। ইতিমধ্যে শুদ্ধিপত্র না দিয়ে কোনো বই বিক্রি করা হবে না বলেও তাঁরা অঙ্গীকার করেছেন। আমাদের ভাষা সংস্কৃতি প্রভৃতির উন্নতি, সুষ্ঠু বিকাশ, সমন্বয়ের জন্য আমরা যদি আন্দোলন সংগঠিত করতে পারি তার সুফল আমরা নিশ্চয়ই পাবো। কিন্তু তা না করে আমরা যদি নিতান্তই আবেগ উচ্ছ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অযৌক্তিক ধ্বংসাত্মক পথে চলি তার ফল হবে বিষময়। দুঃখের বিষয়, আমাদের ছাত্র, যুব ও সাধারণ মানুষকে আমরা ঠিক পথে পরিচালনা করতে পারছি না— আমাদের মধ্যে আজ কোনো পঞ্চানন বর্মা নেই। এমনকী আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি নিয়ে কোনো ভালো পুস্তকও নেই। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক ও নির্মল দাশের লেখা পুস্তক অভাব পূরণ করে না। ড. সত্যেন বর্মণের গবেষণার বিষয়টি এই অভাব অনেকটাই পূরণ করতে পারত। কিন্তু তা এখন পর্যন্ত ছাপা হলো না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমরা আমাদের অতীত সম্পর্কে বোধহয় একটু বেশি কল্পনাপ্রবণ ও আবেগ প্রভাবিত। আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা এখনো মনে করেন, সামন্ততান্ত্রিক রাজার রাজত্বে আমরা সুখে ছিলাম, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-সঙ্গীত ওই সময়েই সমৃদ্ধি লাভ করেছিল— তাই আমরা সেই দিকেই আবার ফিরে যেতে চাই। কিন্তু সেটা কি সত্যি? আর সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু যদি শিক্ষার কথাই বলি, রাজার রাজত্বকালে রাজ্যে শিক্ষার হার কী ছিল? রাজ্যে কত প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল? প্রজাদের যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা এ রাজ্যে হয়নি। রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের যে ব্যবস্থা হয়েছে তা করা হয়েছে রাজার আত্মীয়স্বজন ও পারিষদদের পরিবারের জন্য। তাই তো সারা রাজ্যে যখন প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হাতের আঙুলে গোনা যেত, তখন রাজধানী কোচবিহার শহরে জেনকিন্স স্কুল ও ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপিত হয়েছিল।

সাহিত্য সংস্কৃতির দিকে তাকালেও একই শূন্যতা। কোচবিহার রাজপ্রাসাদ সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিল কিন্তু সেখানে চর্চা হোত কোন সাহিত্যের? আমরা আগেই আলোচনা করেছি, সে সাহিত্যের প্রায় গোটা অংশেই ছিল শিষ্ট বাংলার প্রভাব। কামরূপী বা রাজবংশী ভাষার প্রয়োগ সেখানে নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কী অবস্থা? তখনকার বিখ্যাত ক্লাসিকাল সঙ্গীততত্ত্ববিদ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় রাজদরবারে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন বলে জানা যায়। অথচ কোনো রাজার রাজত্বে কামরূপের অমূল্য সম্পদ ভাওয়াইয়া-চটকার চর্চা হয়নি। প্রজাসাধারণ এই সম্পদকে প্রাণ দিয়ে পরিচর্যা করেছেন, ধরে রেখেছেন এবং এর পরিবর্ধন-পরিমার্জন করেছেন। ভাওয়াইয়া-চটকা সঙ্গীতের অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে বলে আমরা আজ হা-হুতাশ করি। অথচ রাজা-জমিদারদের কারও সময় হয়নি এগুলোর সংকলন করে ধরে রাখার। আসলে সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রই এই। প্রজাসাধারণের প্রাণের সম্পদের বিকাশ রাজার স্বার্থের পরিপন্থী বলেই রাজা মনে করতেন। আমরা কি সেই ব্যবস্থাই আবার চাইবো? আমাদের ছাত্র-যুবদের কাছে অনুরোধ রাখবো ভেবে দেখার জন্য।

উত্তরবঙ্গের শহর, আধা শহর, গ্রাম সব জায়গাতেই আজ রাজবংশীদের সঙ্গে সঙ্গে অ-রাজবংশীদের জনসংখ্যাও কম নয়। সর্বত্র ভাষা, সংস্কৃতিতে এসেছে মিশ্রণের সমাহার। সুখের কথা, অ-রাজবংশী জনগণের বৃহদংশ রাজবংশী সংস্কৃতির সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে--- বরং বলা যেতে পারে এই সংস্কৃতিকে তাঁরা আত্মস্থ করে নিচ্ছেন। এর প্রমাণ আমরা অনেকবার পেয়েছি। ভাষায় আজ এসেছে এক অপূর্ব মিশ্রণ। আজ প্রত্যন্ত গ্রামের হাট-বাজারে পূর্ববঙ্গ থেকে আগতদের ভাষা আমরা বুঝি, কিছু কিছু বলতে পারি, তেমনি ওরাও আমাদের কথা বুঝতে পারে, অশুদ্ধ উচ্চারণ হলেও বলতে পারে। এই অবস্থায় সমবেত হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়াই একমাত্র পথ। প্রয়োজনবোধে আঞ্চলিক ভাষা সংস্কৃতির বিকাশে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা প্রয়োজন সবাইকে সঙ্গে নিয়েই— কাউকে বাদ দিয়ে নয়। উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে রাজ্যের অন্যান্য জেলার চেয়ে শিক্ষায় পিছিয়ে ছিল— তাই যেহেতু শুরু হয়েছে নীচু স্তর থেকে, তাকে টেনে তুলতে হলে প্রয়োজন অধিক শক্তির প্রয়োগ। রাজ্য সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টায় তা সংগঠিত করা প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, বিভেদকামী স্বার্থান্বেষী শক্তির উসকানিতে বিপথে গেলে আমরা কখনোই সেই কাজে সফল হব না।

*(লেখক প্রাক্তন আই এ এস ও লব্ধপ্রতিষ্ঠিত গবেষক)*

# এই সময়

## সাপের তাজ দর্শন

এরকম টুরিস্ট তাজমহল কখনও দেখেনি। ছ'ফুট লম্বা সাপটির জলতেষ্টা পেয়েছিল।

জলের খোঁজে আশ্রয় নিয়েছিল তাজের পানীয় জলের ট্যাঙ্কের নীচে। সাপ দেখে দর্শনার্থীদের চক্ষু চড়কগাছ। হৈ চৈ শুনে ছুটে আসেন রক্ষীরা। অবাঞ্ছিত অতিথিকে বাক্সবন্দি করার পর স্বস্তি ফেরে।

## গরমে সুতি

কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানির নতুন টুইটার ক্যাম্পেনে ফলোয়ারের সংখ্যা দিন-দিন

বাড়ছে। ক্যাম্পেনে স্মৃতি সকলকে গরমে সুতির পোশাক পরার পরামর্শ দিয়েছেন। গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা থাকার টোটকা পেয়ে খুশি সেলেবরা। সঙ্গে তার ছবি।

## ৯৯ থেকে ২৬

ভারতে জোরকদমে চলছে গ্রামে-গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার কাজ। তার প্রমাণ পাওয়া

গেল বিশ্বব্যাঙ্কের একটি সাম্প্রতিক রিপোর্টে। বিশ্বে বিদ্যুৎ ব্যবহারের নিরিখে ভারত এখন ছাব্বিশতম দেশ। ২০১৪-তে ছিল ৯৯ নম্বরে।



# আদি সাংবাদিক নারদ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ১৩ মে কলকাতায় মহাজাতি সদনের অ্যানেক্সে বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্রের উদ্যোগে আদি সাংবাদিক নারদ জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ ড. মনমোহন বৈদ্য তাঁর বক্তব্যে বলেন,

*প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তকে সম্মানিত করছেন ড. মনমোহন বৈদ্য।*

'২০১৪ সালের নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির বিপুল জয়ের পর মার্কিন মুলুকের প্রধান কয়েকটি সংবাদপত্রে লেখা হয়— 'ভারতে এই প্রথম একটি ভারতীয় চিন্তাভাবনার স্বাধীন সরকার ক্ষমতায় এল'। ভারতের সংবাদপত্রগুলি কিন্তু এভাবে লিখতে পারেনি।' অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রূপে উমেশ উপাধ্যায় এবং সভাপতি রূপে বিশিষ্ট সাংবাদিক

*শিলিগুড়িতে সাংবাদিককে মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করছেন ড. বিজয় আঢ্য।*

ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্য এদিন প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, আই বি এমের নবীন সাংবাদিক মহঃ সফি শিয়াসি এবং সোশ্যাল মিডিয়ার কেচ্ছা গ্রুপকে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক

## এই সময়

### মহাসাগরে রণতরী

ভারতের তিন যুদ্ধজাহাজ আই এন এস মুম্বই, আই এন এস ত্রিশূল এবং আই এন এস

আদিত্য জোড্ডায় পৌঁছে গেল। জাহাজ তিনটি সৌদি আরবের নৌবাহিনীর সঙ্গে যৌথ মহড়ায় অংশ নেবে। উদ্দেশ্য, ভারত মহাসাগরের শান্তিপূর্ণ অবস্থা বজায় রাখা।

### কোবরার ছোবল

ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে অন্তত ২০ জন মাওবাদী জঙ্গি সি আর পি এফ-এর কোবরা ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে নিহত জঙ্গিদের অনেকেই সুকমা-কাণ্ডে জড়িত ছিল।

### সুস্থ ভারত

সুস্থ ভারত প্রকল্পের অধীনে দেশের ৫০ কোটি মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দেবে

কেন্দ্রীয় সরকার। প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০টি গ্রাম বেছে নেওয়া হবে যেখানে তিরিশ-উর্ধ্ব যে-কোনো ব্যক্তি এই পরিষেবা পাবেন। জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা।

রন্তিদেব সেনগুপ্ত এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়।

গত ১২ মে মালদা শহরে টাউন হলে নারদ জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ড. তুষারকান্তি ঘোষ, সত্যনারায়ণ মজুমদার এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক বাসব মুখার্জী। অনুষ্ঠানে ১৩ জন প্রবীণ ও ২৫ জন নবীন সাংবাদিককে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদার।

এদিন শিলিগুড়ি শহরেও নারদ জয়ন্তী উদযাপিত হয়। ৫০ জনেরও বেশি সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৬ জনকে বিশেষভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করে দেবর্ষি নারদকে আদি সাংবাদিক হিসেবে তুলে ধরেন আর এস এসের উত্তরবঙ্গ প্রচার প্রমুখ সাধন কুমার পাল। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য। উপস্থিত সাংবাদিকরা এমন একটি অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান।

## ‘শ্রদ্ধা’র ৮৮তম শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১৪ মে বীরভূম জেলার সিউড়ীর নিকট কড়িধ্যাগ্রামের ৮৫ বছর বয়স্কা শ্রীমত্যা কমলা ঘোষালকে ‘শ্রদ্ধা’র ৮৮তম বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। ওঙ্কার, শঙ্খধ্বনি ও মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। দীপ প্রজ্বলন করেন ভুঁইফোড়তলা শিবমন্দির সমিতির সম্পাদক ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী অনাদি চট্টোপাধ্যায়।

উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রীমত্যা ঘোষালের দুই নাতনি— কুমারী সুদত্তা ঘোষাল ও কুমারী চট্টোপাধ্যায়। মেজবৌমা হাত-পা ধুইয়ে শাশুড়ি-মাকে পূজা করেন। মানপত্র পাঠ করেন সুব্রত সিংহ। শ্রদ্ধার পক্ষে অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখেন শ্রদ্ধার সহমর্মী ও শিক্ষিকা শ্রীমতী চৈতালি মিশ্র। পরিবারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন তাঁর মধ্যম পুত্র দামোদর ঘোষাল।

‘শ্রদ্ধা’ ও মায়ের বিষয়ে ২টি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন সরস্বতী শিশুমন্দিরের আচার্যা কুমারী কবিতা সেন। দুটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন নির্মাল্য সোম ও গায়ক, গীতিকার ও শিক্ষক বিমল সোম।

সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন মেজোবৌমা শ্রীমতী রূপা ঘোষাল। শ্রদ্ধা’র সম্পাদক সুনীল বিষ্ণু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও শান্তিমন্ত্র পাঠ করে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

## অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়ের গ্রন্থ প্রকাশ

গত ২৫ মার্চ মহাবোধি সোসাইটি হলে অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায় রচিত গ্রন্থ ‘প্রসঙ্গত মানবেন্দ্রনাথ’ (এম.এন. রায়)-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হলো। এম. এন. রায় প্রতিষ্ঠিত Radical Humanist Association-এর বাংলা মুখপত্র ‘পুরোগামী’ আয়োজিত একটি সেমিনারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সুরেন্দ্রনাথ অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। অধ্যাপক রায় দীর্ঘকাল ব্যাপী ‘স্বস্তিকা’র নিয়মিত লেখক।

# এই সময়

## সাদা টাকা

কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখে সম্প্রতি ক্লিন মানি পোর্টালের উদ্বোধন করলেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। সৎ করদাতাদের নানা সুবিধা দেওয়া ছাড়াও এই ওয়েবসাইট মানুষকে সঠিক সময়ে কর জমা দেবার ব্যাপারে উৎসাহ জোগাবে।

## পুনে অ্যাকশন প্ল্যান

পুনে পুরসভার আধিকারিকেরা আগেই সতর্ক করেছিলেন। তাঁদের কথা মেনে দেবেন্দ্র

ফড়নবিসের মহারাষ্ট্র সরকার পুনে অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করে এক সপ্তাহের মধ্যে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রকল্পে বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। পুরসভার একটি সুষ্ঠু বর্জ্যনীতির জন্য শহরবাসী অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন।

## তথ্য আইন

এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু পোস্ট করলে মুহূর্তের মধ্যে তা ভাইরাল হয়ে যায়। এই

সুযোগে অনেকে ভুল তথ্য দিয়ে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় মানুষকে বিপথে চালিত করেন। তাদের আটকাতে কেন্দ্র নতুন তথ্য সংরক্ষণ আইন আনছে। এবার থেকে অপরাধমূলক কিছু লিখলে আর পার পাওয়া যাবে না।



# ইতিহাস সঙ্কলন সমিতির তথ্যচিত্র প্রদর্শন

গত ১৪ মে ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন সমিতি (পশ্চিমবঙ্গ)-র ক্ষেত্রীয় শাখার পরিচালনায় একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী অনুষ্ঠান হয় কলকাতায় স্যার আশুতোষ মুখার্জী মেমোরিয়াল অডিটোরিয়ামে। একটি দেশের পক্ষে তার সঠিক ইতিহাসের সংরক্ষণ যে জাতি গঠন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষে কতটা প্রয়োজনীয় এই প্রসঙ্গই বার বার উঠে এল বিদগ্ধ বক্তাদের বক্তব্যে। এদিনের প্রধান অতিথি সংস্থার অখিল ভারতীয় সম্পাদক ড. বালমুকুন্দ পাণ্ডে তাঁর সুললিত হিন্দি ভাষণে প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দেন ভারতীয় ইতিহাস বিকৃতির দীর্ঘ ধারাবাহিকতা। তিনি প্রত্যেক জেলার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তরুণদের বিশেষ করে মেয়েদের অংশগ্রহণের ওপর জোর দেন। শ্রী পাণ্ডে প্রামাণ্য ভারত ইতিহাসের পুনর্লিখনের প্রয়াস কেন্দ্রীয় স্তরে ইতিমধ্যেই যে শুরু হয়েছে সে কথাও জানান। এদিনে উপস্থিত আই সি এইচ আর-এর সদস্য ড. শরদিন্দু মুখার্জী থেকে শুরু করে সংস্থার প্রবীণ সভাপতি ড. নিখিলেশ গুহ, জাতীয় অধ্যাপক জয়ন্ত রায়, অধ্যাপক সুমিত ঘোষ প্রমুখ প্রত্যেকের বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দুই ছিল দেশের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিকৃত ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের পন্থা নির্ধারণ। অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের আপ্লুত করে দেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'স্বস্তিকা'র উন্মেষ লগ্নের লেখক নবতিপর অমিতাভ ঘোষ! অটুট স্মৃতি ও ক্ষুরধার মেধায় সমৃদ্ধ ছিল তাঁর বক্তব্য। এদিনের বাড়তি আকর্ষণ ছিল মনোজ দাসের শ্যামাপ্রসাদের জীবননির্ভর একমাত্র বাংলা তথ্যচিত্রটির প্রদর্শন। পরবর্তী পর্যায়ে তরুণ প্রযুক্তিবিদ সৌমেন নিয়োগী নিরলস পরিশ্রমে শিল্পসুষমায় আলোকচিত্রে তুলে ধরেছেন মন্দিরময় ভারতের অপরিচিত কিছু প্রাচীন মন্দিরের অসাধারণ নির্মাণ সৌকর্য। সভায় কলকাতার সেন্ট্রাল বা চাঁদনি যে-কোনো একটি মেট্রো রেল স্টেশনকে ড. শ্যামাপ্রসাদের নামাঙ্কিত করার প্রস্তাব আলোচিত হয়। অধ্যাপিকা শ্রীমতী প্রগতি বন্দ্যোপাধ্যায় সমাপ্তি ভাষণে সকলকে অভিনন্দন জানান। সংস্থার সম্পাদক অমিতাভ সেন অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। কার্যকরী সম্পাদক প্রদীপ চক্রবর্তী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

# শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের স্মারকলিপি প্রদান

গত ১৬ মে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সিউড়ী ডি আই অফিসে এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। শিক্ষায় শাসকদলের দলতন্ত্র কায়েম, বাংলাভাষায় আরবি শব্দ প্রয়োগ করে ভাষার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা, বাংলার মনীষীদের অমর্যাদা, বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজার ঐতিহ্য পুনঃস্থাপন এবং বকেয়া মহার্ঘভাতা না দিয়ে বিদ্যালয়ের কর্মীদের আর্থিক শোষণ ইত্যাদি ১৮ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। প্রতিনিধি দলে বামাচরণ রায়, প্রহ্লাদ মণ্ডল, শিবাজীপ্রসাদ মণ্ডল-সহ ৫৮ জন শিক্ষক ছিলেন।

অতিথি কলম

দীপঙ্কর গুপ্ত

# বিশ্বের বহু দেশের সংস্কৃতিতেই কোনো কোনো প্রাণী বা গৃহপালিত পশুকে হত্যা বা খাদ্যবস্তু করা নিষিদ্ধ

জামায়েত উল উলেমা হিন্দের মৌলানা সৈয়দ আসরাদ মাদানি যিনি আবার সংস্থার সভাপতিও বটে সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন— 'গোরুকে জাতীয় পশুর মর্যাদা দেওয়া হোক'। তাঁর বক্তব্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিরক্ষাজনিত কোনো উদ্দেশ্যে তিনি একথা বলছেন না। বিষয়টি কেবল গোমাংস ভক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে একটু বৃহত্তর পরিধিতে ভাবা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটা বহুল প্রচারিত ও আংশিক সত্যও রয়েছে যে আমাদের দেশে সংখ্যালঘু মুসলমানরা সর্বদাই প্রশ্রয় পেয়ে আসছে। কথাটা পুরো সত্য হলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এত খারাপ কেন? কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ গোহত্যা নিয়ে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষীরা যা বলছেন অর্থাৎ গোহত্যা বন্ধ করা ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী সেই ব্যাপারটা পরখ করে নেওয়া যাক।

একথা সত্যি যে হিন্দুদের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণ প্রায় নিষিদ্ধ বস্তুর মধ্যেই পড়ে কিন্তু ইসলামে কোথাও বলা নেই গোরু কাটতেই হবে। প্রত্যহ গোরুর মাংস পাতে না পড়লে মুসলমানদের ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে, এমন কোনো ব্যাপার কিন্তু নেই। বাস্তবে লক্ষ্ণৌয়ের ওয়োধ অঞ্চল বা হায়দরাবাদ বা কাশ্মীরের যে বিরিয়ানি বেশ প্রসিদ্ধ সেগুলির কোনোটিই গোমাংসের সংমিশ্রণে তৈরি নয়। কোনো প্রবীণ বিরিয়ানি রসিককে গোমাংস দেওয়া হায়দরাবাদী বা লক্ষ্ণৌ বিরিয়ানি দিলে তিনি তাজ্জব হয়ে যাবেন। কেননা কখনও তিনি তা খাননি।

কোনো জীবজন্তু বিশেষকে খাদ্য প্রণালীতে নিষিদ্ধ করে রাখা কেবলমাত্র হিন্দুদেরই একান্ত নিজস্ব ব্যাপার, একথা আদৌ সত্য নয়। বিশ্বের বহু দেশেই নানান প্রাণী গাছপালা এমনকী বহু নিষ্প্রাণ বস্তুকেও খাদ্য তালিকা থেকে আলাদা রাখা হয়েছে। ইজিপ্টের লোকেরা ভাবেন বেড়াল অত্যন্ত পবিত্র প্রাণী। হিন্দুদের মতোই জরাথুস্ত্রিয়রা ষাঁড়কে পবিত্র মনে করে প্রাণীটির হত্যা ও ভক্ষণে নিষেধাজ্ঞা রেখেছে। তাঁদের বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের ধর্মগুরুকে এই ষাঁড়ই বিপদের সময় পরিত্রাণ করেছিল। প্রাচীন চেরোত্রী সম্প্রদায়ের আদি বাসিন্দা আমেরিকানরা ঈগলকে অত্যন্ত শুভ মনে করেন এবং সদা সর্বদা এই পাখিটির রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।

বিশ্বের বহু দেশে ধীরগতির কচ্ছপটির কদর খুবই বেশি। প্রাচীন বা নবীন উভয়েই এটিকে সমাদর করে সংরক্ষণ করেন। পৃথিবীর বিচিত্র সংস্কৃতির নানান দেশেই সেই দেশের প্রতীক হিসেবে অনাদিকাল থেকেই অনেক কিছুই চিহ্নিত হয়ে যায়। তা কোনো প্রাণী হতে পারে বা উদ্ভিদ হতে পারে এমনকী যে প্রাণীকে কেউ কস্মিনকালে দেখেওনি সেটিও হত্যা তালিকায় নিষিদ্ধ হয়ে আছে।

যেমন চীনাদের ক্ষেত্রে প্রায় প্রতীকী সম্পর্ক রয়েছে ড্রাগনের সঙ্গে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় বসবাসকারীরা দু' লেজওয়ালা সিংহকে জাতীয় প্রতীক মনে করে। মজার কথা, এই দুটি প্রাণীরই কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। তাই মানুষ ও প্রকৃতি যে প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক সহাবস্থান করে এসেছে তা আমাদের রাজনৈতিক পরিভাষায় 'আমরা-ওরার' জটিলত্বের থেকে আরও অনেক বেশি কূট ও সহজব্যাখ্যা সমৃদ্ধ নয়।

> ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল প্রভৃতি বিশ্বের নানান সংস্কৃতিতে প্রিয় পোষ্য হিসেবে আদর পেয়ে থাকে। সেই কারণেই সেই সব দেশে সেগুলিকে অনায়াসে খাদ্যবস্তু করে তোলা কদাচার হিসেবে গণ্য হওয়ার সঙ্গেই বেআইনি হিসেবেও পরিগণিত হয়।

আমাদের দেশের ২৯টি রাজ্যের মধ্যে ২৪টিতে গোমাংস নিষিদ্ধ আছে। এছাড়া সংবিধানও আমাদের গোসম্পদ রক্ষা করার বিধান দিয়েছে। বিশ্বের বহু দেশে বহু প্রাণীর মাংস খাওয়া বারণ। তার কারণ যে সব সময় ধর্মীয়, তা আদৌ নয়। কিন্তু যখন কোনো প্রচলিত আইন কোনো প্রাণীর হত্যাকে নিষিদ্ধ করে থাকে তখন সেই আইনটি দেশের সকল নাগরিকের ওপর বর্তায়। এর কোনো ব্যতিক্রম করা যায় না। জার্মানি, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ডের মতো আরও অনেক দেশে কুকুরের মাংস নিষিদ্ধ খাদ্য। আমেরিকার ৬টি রাজ্যে কুকুরের মাংস পুরোপুরি অচল।

হাঁস বা মুরগির মতো কিছুকাল পালন করার পর তার মাংস খাওয়ার অভ্যাসের মতো দীর্ঘদিন কুকুর পুষে তারপর তাকে কেটে খাওয়ার চিন্তা আজ পৃথিবীতে ঘৃণ্য কাজ বলে পরিগণিত হচ্ছে। তাই বহু দেশে আজ এটি আইনগ্রাহ্য অপরাধ। এই ভাবে কুকুরের মাংস ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। এমনকী কুকুরভুক তাইওয়ানিরাও পাশ্চাত্যকরণের ফলে কুকুরের মাংস বিক্রি বেআইনি করেছে। চীনেও এই নিয়ে শোরগোল চলছে যদিও আগে চীন সর্বভুক ছিল। চীনে অনেকে বলেছে এই কুকুর প্রেম ‘পরিবারে একটি শিশু’ এই সরকারি নিয়ম জারির পর থেকে বেড়েছে। কারণ সময় বসবাসের স্থান একটি শিশু থাকার ফলে অবশ্যই বেড়েছে। স্নেহের ও থাকার জায়গা পেয়েছে কুকুর। অথচ কিছুদিন আগে— ১৯৮৩ সালের বেজিংয়ে কুকুর পোষা ছিল অপরাধের অঙ্গ। আমারিকাতে সেইভাবে ঘোড়ার মাংস খাওয়াকে কেউই খুব একটা সুনজরে দেখত না, কিন্তু অনেকেই খেত। অবশ্য এটা ঘটেছিল এমন একটা সময়ে যখন খাদ্যবস্তুর টানাটানি দেখা দিয়েছিল ভয়ঙ্কর, এমনকী রান্নার নুনও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল।

আজকের আমেরিকায় কিন্তু ঘোড়ার মাংস নিষিদ্ধ করে নির্দিষ্ট আইন আছে। তার পেছনে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিধান নেই। এটা হয়তো সত্যি আজ থেকে ৫০০ বছর আগে কোনো Gregory নামের পোপ ঘোড়ার মাংস খেতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু ২০০৭ সালে ঘোড়ার মাংসে নিষেধাজ্ঞা জারির সময় সেই আইনের কথা কারুর মনেও আসেনি।

তাই দেখা যাচ্ছে ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল প্রভৃতি বিশ্বের নানান সংস্কৃতিতে প্রিয় পোষ্য হিসেবে আদর পেয়ে থাকে। সেই কারণেই সেই সব দেশে সেগুলিকে অনায়াসে খাদ্যবস্তু করে তোলা কদাচার হিসেবে গণ্য হওয়ার সঙ্গেই বেআইনি হিসেবেও পরিগণিত হয়। বিষয়টা কখন কবে কোথায় এইসব পশুদের হত্যা ও খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা কী মানবিক আবেগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল বা তার পিছনে কী যুক্তির অবতারণা ছিল এগুলি আদৌ বিচার্য নয়। এটি ধর্মীয় হতে পারে, কোনো প্রাণী বিশেষের প্রতি অপত্য স্নেহের কারণেও হতে পারে। কিন্তু এটা মাথায় রাখা সব সময় দরকার যখনই এই সংক্রান্ত কোনো বিধিনিষেধ দেশে বা অঞ্চলে নির্দিষ্ট আইন বলে জারি আছে তখন তাকে অবজ্ঞা করার প্রশ্নই ওঠে না। আইনের পেশী যতটাই দীর্ঘ ততটাই শক্তিশালী। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আজকের দিনে কুকুরের মাংস খাওয়ার অধিকারকে আইনসঙ্গত বলে দাবি করলে মার্কিন আদলত তা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে।

ইত্যবসরে, সন্দেহ নেই, অনেকেই ছাগলের মাংসকে কুকুরের মাংস, গোরুর মাংসকে ঘোড়ার মাংস বা খরগোশের মাংসকে বেড়ালের মাংস বলে বিক্রির চেষ্টায় লোককে ধোঁকা দেবে। কোনো কিছু নিষিদ্ধ থাকলে এমনটা হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। কিন্তু সেই সন্দেহ থেকে যদি গোরক্ষার নামে নরহত্যা হয়ে যায় তাহলে সামগ্রিক ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হবে। অতি উৎসাহী গোরক্ষক সংরক্ষণের নামে সন্দেহের বশে হত্যায় জড়িয়ে পড়লে আইনের পথেই তার নির্দিষ্ট শাস্তি হবে। কিন্তু এর সঙ্গে গোরুর মাংস খাওয়া ‘গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে পড়ে’ এমন অসম্ভব যুক্তি খাড়া করার অর্থ কী?

পূর্বাপর পর্যালোচনা করে দেখা যায় ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে গোরুর মাংসের গোঁ ধরে থাকাটা ঠিক নিউইয়র্কের কোনো রেস্তোঁরায় গিয়ে কুকুর বা ঘোড়ার মাংসের কোনো পদ চাওয়ার মতোই অন্যায় আবদার। তাই যা কিছু খাদ্য হিসেবে নিষিদ্ধ তাকে ধর্মীয় মোড়কের পবিত্রতা না দিলেও আইনগ্রাহ্যতাকে এড়ানো যায় না। এক্ষেত্রে ধর্ম বা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্ন অবান্তর। ■

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name : United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

# চিঠিপত্র

## এ রাজ্যে ভারতের শাসন চলে না

কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম নুর উর বরকতি বলেছে যে সে তার গাড়ির লালবাতি খুলবে না। কারণ এই রাজ্যে ভারতের শাসন চলে না। এই কথাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যদি হালের মমতা দিদির পশ্চিমবঙ্গ নাম পাল্টে বাংলা করার বায়নার সঙ্গে জুড়ে দেখা হয়। অদ্ভুত ব্যাপার যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের কতই মিল। বরকতি প্রধানমন্ত্রীর আদেশ অমান্য করার সাহস পেল কী করে? কার জোরে সে বলছে যে এই রাজ্যে ভারতের শাসন চলে না? এইসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তাহলে কি তলায় তলায় সব প্রস্তুতি হয়ে গেছে? এখন কি কেবল জাল গোটানোর পালা? না কি জাল গোটানো শুরু হয়ে গেছে?

গত পাঁচ বছরের ঘটনাগুলি মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা যাক। মুসলমান দুষ্কৃতী দ্বারা হিন্দু মেয়েদের ধর্ষণ বেড়েছে— পার্কস্ট্রিট থেকে কামদুনী সর্বত্র একই দৃশ্য। তারপরে রানাঘাটের চার্চের মাদার সুপেরিয়র-কে ধর্ষণের ঘটনা। দোষ প্রথমে হিন্দু মৌলবাদীদের ওপর চাপানো হয়। পরে জানা যায় দুর্বৃত্ত বাংলাদেশের দিকে পালিয়েছে, তখন আর কোনো উচ্চবাচ্য নেই। সেটাও মুসলমান দুষ্কৃতীরই কাজ। এখন ছোটখাটো দাঙ্গা হাঙ্গামায় বাংলাদেশ থেকে আসা লোকের হাত আছে বলে খবর আসছে। তার উপরে মমতার রাজ্যের নাম পরিবর্তনের বায়না। সর্বোপরি বরকতির এই কথায়— এ রাজ্যে ভারতের শাসন চলে না— আমার মনে হয় প্রস্তুতিটা শেষ হয়ে গেছে। এখন জাল গোটানো চলছে।

এই রাজ্যের হিন্দু বাঙালির ঘুম বড় দেরিতে ভেঙেছে। গত ৪৪ বছর ধরে মুসলমানরা প্রস্তুতি নিয়েছে। আর হিন্দু বাঙালি গত ১ বছরে সবেমাত্র আড়মোড়া ভেঙে উঠেছে। বাংলার হেন ছোট মাঝারি কর্মক্ষেত্র নেই যেখানে মুসলমানরা কবজা করেনি। গ্রামাঞ্চল পুরোপুরি মুসলমানদের পেটে গেছে। মফস্সলে আধা মুসলমান। আর শহরটা এখনো টিম টিম করে টিকে আছে হিন্দুদের হাতে। এইভাবে দাঙ্গা আর লুটপাট করে হিন্দু তাড়াচ্ছে মুসলমানরা আর জায়গা দখল করে নিচ্ছে। হিন্দুদের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা আছে ঠিকই, কিন্তু ভোটবাক্সের রাজনীতির গুঁতোয় সেটা এখন থাকা না থাকা দুইই সমান। এইভাবে যদি হিন্দু হত্যা আর বিতাড়ন চলতে থাকে তাহলে পশ্চিমবাংলা অবিলম্বে হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে বাংলাদেশের মতো।

এখন আবার স্কুলে ইসলাম ঢোকানোর চেষ্টা চলছে। নবি দিবস পালন করা, বাংলার বরেণ্য মনীষীদের অপমান করা, সরস্বতী পূজা বন্ধ করার মধ্য দিয়ে বাংলার সরলমতি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ইসলামের বীজ বপন করা হচ্ছে। একবার শিশুদের মগজধোলাই করে একটা জেনারেশনকে পঙ্গু করে দিতে পারলে পরের সবকটা প্রজন্মকেই কবজা করা যাবে। রাস্তায় রাস্তায় আর মেলায় মেলায় ইসলাম সম্পর্কে লেখা পুস্তিকা বিনামূল্যে বিলি হচ্ছে। এগুলি কোনোটাই ভালো লক্ষণ নয়। আগে এগুলি হয়নি। হিন্দু নারী ধর্ষণ, লুটপাট-দাঙ্গা, স্কুলে ইসলাম ঢোকানো, ইসলামের বই বিলানো, মুসলমান রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, রাজ্যের নাম পরিবর্তন, বরকতির হুঙ্কার— সবকটা কাজ একই সঙ্গে চলছে। আর এই সবকটা একটা দিকই নির্দেশ করছে তা হলো বাংলায় বকলমে মুসলমান শাসন। এখন তো দিদির পার্টিতেও মুসলমান নেতাদের আধিক্য। সেটাও এই বকলমে মুসলমান শাসনের দিকেই ইঙ্গিত করছে। আর এই মুসলমানরা আসছে বাংলাদেশ থেকে। অর্থাৎ এখানে বকলমে বাংলাদেশের শাসন চলছে। তাই এই রাজ্যে ভারত সরকারের নীতি চলে না। কত সুলভে উর্দুভাষী ও বাংলাদেশি মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গকে কবজা করলো?

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের উচিত পশ্চিমবঙ্গে কাশ্মীরের মতো সেনা পাঠানো। একমাত্র সেনাবাহিনীই পারে হিন্দুদের বাঁচাতে। দুর্বল হিন্দুদের পাশে সেনা না দাঁড়ালে কোনোভাবেই বাংলায় হিন্দুরা বাঁচতে পারবে না। আফস্পা আইন প্রয়োগ করাও অত্যন্ত দরকার। এই আইনের বলেই সেনারা কাশ্মীরকে ভারতের মধ্যে রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গেও তাই করতে হবে। এইটাই এখন ভীষণ প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি শাসন হলো আরেকটা অস্ত্র। গণতান্ত্রিক উপায়ে কোনোদিনই মৌলবাদী মুসলমানদের দমন করা যাবে না, কারণ ওরা দলবদ্ধ ভাবে ভোট দেয়। মোদী সরকারের উপরে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ভরসা আছে। দেখা যাক কী হয়।

**—অর্ণব কুমার ব্যানার্জি,**

কলকাতা-৪৮

## যোগেশের হুমকিতে দেশজুড়ে অশান্তি আর বরকতির ফতোয়াতে শান্তির বাতাবরণ

কয়েকদিন আগে আলিগড়ের বিজেপি যুব মোর্চার নেতা যোগেশ বার্ষ্ণেয় ফতোয়া জারি করেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিরচ্ছেদ করতে পারলে তিনি ১১ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন। কারণ হিসেবে বলেছেন, হনুমান জয়ন্তীর মিছিলে বাংলায় যেভাবে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে তা দেখে তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস মমতা একজন হিন্দুধর্ম বিরোধী অসুর। একজন অসুরের সভ্য সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

তাঁর এই মন্তব্যে গোটাদেশ এবং সংসদের উভয় কক্ষে ঝড় উঠেছে। এটাই স্বাভাবিক এবং এটাই হওয়া উচিত। বিজেপির পক্ষ থেকেও নিন্দা করা হয়েছে এবং তারা বলেছে, যোগেশ বিজেপির কেউ নয়। দু'বছর আগেই তাকে দল থেকে

বহিষ্কার করা হয়েছে। বিজেপি আরও বলেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও তাই চায়।

এটাই হওয়া উচিত। কেননা দেশে কোনো ফতোয়া বা হুমকির বিরুদ্ধে একযোগে প্রতিবাদ করলে এবং ফতোয়ার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিলে ভবিষ্যতে আর কেউ কারও বিরুদ্ধে হুমকি বা ফতোয়া দিতে সাহস পাবে না।

কিন্তু যখন দেখা যায় একই রকম ফতোয়া যদি বিশেষ কোনো ধর্মের লোক জারি করেন আর সেই ফতোয়ার বিরুদ্ধে সবাই বোবা সেজে থাকেন তখন মনে হয় 'ডাল মেঁ কুছ কালা হ্যায়'। যেমন, নোট বাতিল কাণ্ডে কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতি কলকাতায় প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পাপী বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর চুল, দাড়ি কামিয়ে সর্বাঙ্গে কালি লেপন করে দিলে ২৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। সেই সভায় শাসকদলের এক মুসলমান নেতা টেবিল চাপড়ে বরকতিকে বাহবাও দিয়েছেন। তারও আগে বরকতি বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার জন্য মানুষকে উত্তেজিত করেন, খুন করার প্ররোচনা দেন এবং দাঙ্গা বাধানোর চক্রান্ত করেন। বরকতি কিন্তু তাঁর ফতোয়ার সমর্থনে যোগেশের মতো কোনো যুক্তি দেখাননি। তখন কিন্তু বিজেপি বিরোধীরা সংসদের উভয় কক্ষে বা গোটা দেশে বরকতির ফতোয়া নিয়ে সোচ্চার হননি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনো নেতা-নেত্রীও বরকতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হননি। এমনকী পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনো আইনি পদক্ষেপও করেনি। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সি আই ডি অতি তৎপরতার সঙ্গে যোগেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে।

যোগেশ একজন অর্বাচীন রাজনৈতিক ব্যক্তি উপরন্তু দল থেকে বহিষ্কৃত। তার গুরুত্বও অনেক কম। কিন্তু বরকতি একজন বয়স্ক এবং বিচক্ষণ ধর্মীয় নেতা। উপরন্তু আমরা শুনি ইসলাম নাকি শান্তির ধর্ম। অথচ সেই শান্তির ধর্মের ধর্মীয় নেতা দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং তার দলের একজন বিধায়ককে ওইভাবে ফতোয়া দিলেও ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী রাজনীতিক, কলমচি, বুদ্ধিজীবীরা আজ যোগেশের বিরুদ্ধে গর্জন করলেও বরকতির বিরুদ্ধে চুপ। কেন? ভোটের লোভে? না আরবের তৈলাক্ত ডলারের লোভে? তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

—**মণীন্দ্রনাথ সাহা,**
গাজোল, মালদহ।

# মুসলমান সংগঠনের ইজরায়েল বিরোধী বিক্ষোভ

ইজরায়েলের রাষ্ট্রপতি রুবেন রিবলিনের ভারত সফরের বিরোধিতা করে কয়েকমাস আগে জুম্মানামাজের পর দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সদস্যরা। এই সভায় তারা ইজরায়েলকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করে মুসলমান নেতৃবৃন্দ মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে রাষ্ট্রপতির নিকট একটা স্মারকলিপি জমা দেন। এখানে একটা প্রশ্ন জাগে, ইজরায়েল কোনোদিনও ভারতের উপর সন্ত্রাসী হামলা চালায়নি অথবা ভারত বিরোধিতায় লিপ্ত হয়নি। পক্ষান্তরে, ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের পিতৃভূমি পাকিস্তান অনবরত সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে ভারতকে বিধ্বস্ত করছে। সেই পাকিস্তানের রাষ্ট্র প্রধানরা যখন ভারত সফরে আসেন তখন এদেশে বসবাসকারী মুসলমানরা পাকিস্তান নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কোনো বিক্ষোভ দেখান না কেন? তাহলে কি ধরে নেব যে এদেশে বসবাসকারী সমস্ত মুসলমানই পাকপন্থী? উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছিল তখন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মুসলমান নেতা দলমত নির্বিশেষে কলকাতাস্থ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের সঙ্গে দেখা করে আচ্ছেলাম ওয়ালাইকুম বলে সম্বোধন করে তাদের পাকিস্তান ভাঙার চক্রান্ত থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানান। এমনকী তর্কাতর্কির ধস্তাধস্তির পর্যায়ে পৌঁছয়। স্থানীয় মুসলমানরা বাংলাদেশের শরণার্থীদের কোনো সাহায্য দিতে এগিয়ে আসেননি।

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

# প্রসঙ্গ নেতাজী

২৩ জানুয়ারি 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু'র জন্মদিন সারাদেশে মহাসমারোহে শ্রদ্ধার সহিত পালিত হয়।

'নেতাজী' বলে সারা ভারত তথা বিশ্ব একজনকেই জানে। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। ইদানীং কিছু পত্র-পত্রিকায় উত্তরপ্রদেশের সপা নেতা মুলায়ম সিংহ যাদবকে 'নেতাজী' বলে উল্লেখ করছে। এক সময় জয়প্রকাশ নারায়ণকেও নেতাজী বলে উল্লেখ করা হোত। ঘরে ঘরে নেতাজী? ভাবা যায়! নেতাজী একজনই জন্ম নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় নেতাজীর এখনও জন্ম হয়নি।

মুলায়ম সিংহ যাদব একটি রাজ্যের ক্ষুদ্র দলের আঞ্চলিক নেতা। বর্তমানে সেই পদটিও হারাতে বসেছেন বাপবেটার লড়াইয়ে। তাই যাকে-তাকে নেতাজী বলে সম্বোধন করা মানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে অপমান করা। 'নেতাজী' হতে হলে সুভাষ বসুর মতো গুণাবলী অর্জন করতে হবে। তাই কোনো রাজনৈতিক নেতাকে নেতাজী বলে ফলাও করে কাগজে প্রকাশ করার আগে একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

—**অনিল চন্দ্র দেবশর্মা,**
দেবীবাড়ি, কোচবিহার।


**ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের**
**মুখপত্র**
**প্রণব**
**পড়ুন ও পড়ান**

# ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ এবং গোরক্ষা আন্দোলন

**সারদা সরকার**

গোরক্ষা আন্দোলনে ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের ভুমিকা ইতিহাসে লেখা হয়ে আছে। শাস্ত্রপুরুষ সীতারামের নিজের লেখা উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধের শুরু করা যাক। লেখাটি অনেকগুলি প্রকাশিত লেখার মধ্যে একটির অংশবিশেষ। জয়গুরু সম্প্রদায়ের পত্রিকা মণিমঞ্জুষায় প্রকাশিত হয়েছিল ষাটের দশকে কোনো এক সময়।

"গোমাতা
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ্যহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।"
"মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসুনাং,
স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ।
প্রণুবোচং চিকিতুযে জনায়, মা
গামনাগামদিতিংবধিষ্ঠ।।"

ঋক্‌বেদ বলেছেন, গোমাতা দশপ্রাণ ও আত্মা এই একাদশ রুদ্রের মাতা; পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যৌ, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্রমা ও নক্ষত্রসকল— এই অষ্টবসুর দুহিতা; দ্বাদশ মাসের আত্মা; বিষ্ণুর ভগিনী; জীবমাত্রের জীবনরক্ষণকারিণী জীবনশক্তির কেন্দ্র। গো-সকলের প্রতি মনুষ্যদিগের কর্তব্য বিচারকারীর প্রতি শ্রীভগবানের আজ্ঞা— নিরপরাধ গো-সকলকে বধ করিবে না।

অগ্নিপুরাণ বলেছেন--- 'গাবঃ পবিত্রামঙ্গল্যা গোষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। গো-সকলের দেহে সমস্ত দেবগণ বাস করেন, সেই হেতু যদি গো-সকল রক্ষিত ও পালিত হয় তাহা হইলে সমস্ত দেবতাগণ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম সুরক্ষিত হইবে। এই কারণে সর্বপ্রকারে গোরক্ষা করিবে। এই গোরক্ষা কার্যে যাঁহারা ব্রতী শ্রীভগবান তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেন"।

বহু বছর আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় চিঠিপত্রের কলমে ঠাকুর ওঙ্কারনাথের একটি

চিঠি ছাপা হয়েছিল। গোহত্যার বিপক্ষে তিনি শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়ে যা লিখেছিলেন, ঠাকুরের নামেই তা ছাপা হয়েছিল। চিঠিটির সঙ্গে একটি মৃতপ্রায় গোরুর ছবিও ছাপা হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকার তরফ থেকে। বিদ্রূপাত্মক এই প্রকাশনায় সীতারামদাস ওঙ্কারনাথকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টাই করা হয়েছিল এবং ব্যথিত হয়েছিলেন তাঁর লক্ষ লক্ষ শিষ্য-শিষ্যা। তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক্‌পাল প্রফেসর গোপীনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন 'পথের আলো' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর সম্পাদনায় 'পথের আলো'তে শুরু হলো লেখালেখি। গোহত্যার নানা খারাপ দিক নিয়ে আলোচনা হোত সেই সময়কালের জয়গুরু সম্প্রদায়ের পত্রপত্রিকাগুলিতে। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে গণস্বাক্ষর তেমন পরিচিত প্রতিবাদ মাধ্যম ছিল না, কিন্তু সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ চিন্তাধারায় খুব আধুনিক ছিলেন। তাই শুরু করেছিলেন গোহত্যার বিরুদ্ধে সেই গণস্বাক্ষর অভিযান। ঘরে ঘরে অনশন ব্রতের ডাক দিয়েছিলেন ঠাকুর। সীতারাম সে যুগে একটা ভাবান্দোলন গড়ে তুলেছিলেন নিশ্চয়ই। নির্ভয় ত্যাগী এই যোগীপুরুষ জোর গলায় বলতেন, 'শাস্ত্রপথ প্রহরীবেষ্টিত রাজপথ'। তাই যত আধুনিক, যত নাস্তিকই হোক, তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে তারা মাথা নত করতে বাধ্য হোত। সংসার ফেলে পুরুষ নারী সকলে তাঁর আদর্শে ব্রতী হোত এক কথায়।

গোরক্ষা আন্দোলন চলছে তখন ঠাকুরের কাছে মন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ এলেন। এলেন অবশ্য অন্য একটি কাজে। ঠাকুর তখন হৃষীকেশে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ইতিহাস ঘাঁটলে এই ঘটনার উল্লেখ অবশ্যই পাওয়া যাবে। হিমালয়ের ওপর চীন একটি টাওয়ার লাগায়। সেই টাওয়ার প্রায় ধসে গঙ্গার ওপর পড়ে যায় যায় এমন অবস্থা। কোনো ভাবে তা পড়ে গেলে গঙ্গার অপরিসীম ক্ষতি হোত। নন্দাজী এসেছিলেন সেটির পরিদর্শনে। তখন শ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা জানিয়ে যান, যেন কোনো বড় বিপদ না হয়ে যায়। ঠাকুর ওঙ্কারনাথ শুরু করেন গঙ্গাপূজা। গঙ্গায় আহুতি দেন তাঁর সাধনার অঞ্জলি। দৈবীকৃপায় ধীরে ধীরে সেই টাওয়ার একদিন হিমালয়ের ফাটলে ঢুকে যায়। রক্ষা পায় গঙ্গা এবং সারা ভারতবর্ষ। যাইহোক, গুলজারিলাল নন্দাজীকে সেদিন ঠাকুর জানিয়ে দিলেন এই গোহত্যা আন্দোলনে তাঁর পূর্ণ সমর্থনের কথা। গুলজারিলাল নন্দ আবার ফিরে আসেন ভাদ্রমাসে, এবার সস্ত্রীক। সাদর অভ্যর্থনায় দু'জনে বসেন ঠাকুরের সামনে। ঠাকুর প্রথমেই তাঁকে বলেন, 'শুনেছি দিল্লিতে গোরক্ষার জন্যে অগণিত সাধুসন্ত আন্দোলন করছেন এবং তাঁরা দিল্লির রাজপথে অনশনেও বসতে চলেছেন, আপনার কী মতামত?' নন্দাজী হাতজোড় করে বলেন, 'বাবা, গোহত্যা বন্ধের দাবি যুক্তিযুক্ত হলেও এই অনশন এবং প্রতিবাদ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, আমার বাড়ির দরজার সামনে বহু সাধু সন্ত বসে রয়েছেন প্রতিবাদ অনশন ধরনা দিয়ে। এসব কি সাধুবাবাদের কাজ? এভাবে ওনাদের দেখতে আমার একটুও ভালো লাগে না। সামনে ইলেকশান তাই এইসব করছেন ওঁরা। গো-বধ নিরসন করতে আমারও আপত্তি নেই কিন্তু গোহত্যা একদম বন্ধ হয়ে গেলে দেশে খাদ্যসঙ্কট দেখা

দেবে, তখন সরকার এসব সামলাবে কী করে?' ঠাকুরকে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে এই আন্দোলন সমর্থন না করার জন্য অনুরোধ করেন। কারণ তিনি জানতেন হয়তো নামাবতার সীতারামের প্রচেষ্টা বিফলে যায় না কখনও।

সীতারাম ওঙ্কারনাথ অনড় অচল থেকে বললেন, 'সাধুসন্তেরা আমার কাছে এসেছিল এবং আমার পূর্ণ সমর্থন আছে এই আন্দোলনে'। শীর্ণ শরীর, ত্যাগের মূর্ত প্রতীক ঠাকুর কিন্তু শাস্ত্রধর্ম প্রসঙ্গে আপোশহীন। ক্ষেত্রবিশেষে আধুনিকও বটে। সে কোনকালে ষাটের দশকে শুরু করেন 'আর্যনারী পত্রিকা' অথবা 'সতীসঙ্ঘ' যা শুধুমাত্র সম্প্রদায়ের মেয়েদের/মায়েদের জন্য। নারীর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে এই পদক্ষেপ তখনকার সময়ে একটু বিরল তো বটেই। সেই সময় করপাত্রেজী মহারাজ অনশন করছেন গোরক্ষার জন্য। করপাত্রেজী দু'হাতের মুঠিতে যেটুকু ধরত, সেটুকুই খেতেন, সেটুকুই পান করতেন। ওদিকে নীলাচলের শঙ্করাচার্য ও বৃন্দাবনে শ্রী প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজীও অনশনে বসলেন গোহত্যার প্রতিবাদে। সেটা ছিল ইংরেজির ১৯৬৬ সাল, বাংলা ১৩৭৩। ২৫ অঘ্রাণের এক শীতল সকালে ওঙ্কারনাথ ঘোষণা করলেন আর একমাসের মধ্যে যদি বাংলা সরকার গোহত্যা বন্ধের নির্দেশ না দেন, তাহলে তিনিও অনশনে বসবেন। বাংলায় গো-বধ রোধে সরকারই একমাত্র কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই এই যুদ্ধঘোষণা তাঁর।

এদিকে বৃন্দাবনের প্রভুদত্তজী এবং পুরীধামের শঙ্করাচার্যের স্বাস্থ্যহানির চিন্তায় দয়াল ঠাকুর উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তাঁদের টেলিগ্রাম করে বলেন ভারতে গো-বধ বন্ধ হবে, হবে হবেই। কিন্তু আপনাদের দেহ চলে গেলে অধ্যাত্ম জগতের অশেষ ক্ষতি, আপনাদের এই অনশনে সীতারাম বড়ই উদ্বিগ্ন। আপনাদের শরীরের অবস্থা কেমন জানান এবং দয়া করে অনশনের পথে না গিয়ে অন্য কোনো উপায়ে আন্দোলন করা যায় কি না সেকথা ভাবুন। শুধু টেলিগ্রাম করে ক্ষান্ত থাকেননি ঠাকুর, প্রিয় শিষ্য সচ্চিদানন্দ এবং গঙ্গানন্দকে পাঠান তাঁদের কাছে। বলে দেন ওঁরা অনশন যতক্ষণ না স্থগিত করেন, ততক্ষণ ওদের পা ধরে বসে থাকবি, একদম ছাড়বি না, বলবি ওঙ্কারনাথের অনুরোধ, আপনারা এভাবে নিজেদের শেষ করে দেবেন না।

কিন্তু বৃন্দাবন এবং পুরী থেকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসে ঠাকুরের দূত। এবার শুরু হয় বিভিন্ন ধর্মীয় সঙ্ঘের সঙ্গে টেলিগ্রাম, ট্রাঙ্ককল এবং পত্রের মাধ্যমে নানা আলোচনা। গোরক্ষা আন্দোলন জোরালো করার বিষয় নিয়ে আলাপ চলতে থাকে। সীতারাম শাস্ত্রপথ বিবর্জিত শাসকদলের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ উগরে দেন। এই শাসকেরা, দেশের মঙ্গলের কোনো কাজেই আসে না। যতদিন না এদের ধর্মবুদ্ধি জাগানো যায়, ততদিন গোহত্যা বন্ধের কোনো আশাই নেই। অধর্মের অভ্যুত্থান এবং কলির তাণ্ডবনৃত্য হবে এই ভারতভূমে— এই আশঙ্কায় দয়াল ঠাকুর তাঁর ত্রৈকালিক প্রার্থনায় এই চারলাইন সংযোজন করেন।

'তোমার গো-রক্ষা তরে দীর্ঘ অনশনে
সঙ্গী তাদের প্রাণ রহিবে কেমনে।
শ্রী শঙ্করাচার্য আর প্রভুদত্ত প্রাণ—
কৃপা করি কর রক্ষা সর্বশক্তিমান।'

২ পৌষ মহামিলন মঠে সভা আয়োজিত হলো, এলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন-সহ বহু বিশিষ্ট জন। ঠাকুর বললেন যে, 'গোহত্যা বন্ধ করা আবশ্যক, এটা অগণিত জনতার প্রার্থনা, এতে কোনো পক্ষপাত বা ধর্মবিদ্বেষ নাই। অগণিত জনতার দাবি গণতন্ত্রে পূরণ হওয়া উচিত।' মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন মৌখিকভাবে বলেন যে তিনি ঠাকুরের পক্ষ সমর্থন করবেন।

৫ পৌষ সংযোজন হলো ত্রৈকালিক প্রার্থনায় আরো চার পংক্তি : 'ভারত শাসকবৃন্দ শাস্ত্র পরিহরি/ছুটেছেন ধ্বংসপথে রক্ষা কর হরি/ তাঁহাদের শুভবুদ্ধি করিয়া প্রদান/ এ সঙ্কটে রাজকুলে রাখ ভগবান।' লক্ষ লক্ষ ভক্তশিষ্য দিনে তিনবার করে এই প্রার্থনা পাঠ করতে লাগল। গণস্বাক্ষর সংগ্রহের পাশাপাশি প্রার্থনা, এবার যুক্ত হলো অনশনে বসার প্রতিজ্ঞা। একা নয় শুধু বললেন আমরা ঘরে ঘরে অনশন করব গোহত্যা বন্ধের আর্জি জানিয়ে। আকুল হলো সাধুসন্তেরা। ক্ষীণশরীর সীতরামের। অনশনের ধকল সইতে পারবেন না জানা কথা। তাই পণ্ডিতমণ্ডলী ঠাকুরকে ব্যাকুল অনুরোধ করল ব্রাহ্মণের পক্ষে অনশন অতি গর্হিত কাজ। শাস্ত্রীয় বিধানের পরিপন্থী, তাই ঠাকুর যেন আমরণ অনশনে না বসেন। প্রমাদ গুনল শাসককুল। প্রফুল্ল সেন আশ্বাস দিলেন সীতারামকে গোহত্যা বন্ধের। সীতারাম পণ্ডিতদের বিধান এবং শাস্ত্রবাক্য ফেলতে পারেননি, এছাড়া মন্ত্রীর আশ্বাসবাণীও জুটেছিল তখনকার মতো। তাই অগণিত শিষ্যের অনুরোধে অনশনে বসার সংকল্প ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তবে গো-সেবা সীতারামের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ ছিল। সুরভি নামের গাভীকে রোজ নিজের হাতে খাওয়াতেন। তার গায়ে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিতেন। মহামিলন মঠের এবং অন্যান্য আশ্রমের গোশালা আজও সেই ঘটনার সাক্ষ্য দেয়। লক্ষাধিক শিষ্য সমবেত স্বরে রোজ প্রার্থনা করে চলেছে হিন্দু ভারতীয়ের নানারকম আশার কথা। তেমনই একটি প্রার্থনা হলো আজকের বহুবিবাদিত রাম জন্মভূমি নিয়ে—

'তোমার জন্মভূমি উদ্ধারের তরে/কোটি কল্পবর্ষ ধরি তব ভক্তগণ/ সীতারাম নাম সদা করে প্রেমভরে/সত্বর তাদের কর অভীষ্ট পূরণ।'

কিংবা 'দয়াময় বিশ্বনাথ ওহে মহাকাল/ সমগ্র তিব্বতবাসী শত্রুর পীড়নে/ করে ঘোর আর্তনাদ কাঁদিয়া কাঁদিয়া/ তাদের বাঁচাতে নাথ ওঠ হে জাগিয়া'।

অথবা 'জগজ্জননী বাণী করিয়া করুণা/ দেবরাষ্ট্রভাষা রূপে হও অবতীর্ণা/ অধম তনয়গণ যাচে বার বার/ ভূতলে সংস্কৃতভাষা হউক প্রচার।'

আজকের বর্তমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গোহত্যা বন্ধের এই ঐতিহাসিক ঘটনা বড়ই প্রাসঙ্গিক। ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ স্থূলদেহে না থাকলেও রয়েছেন সূক্ষ্মশরীরে সকল শাস্ত্রাবলম্বী হিন্দুর সঙ্গে। তাঁর প্রবল ধর্মানুরাগ এবং দৃঢ়তা আজকের দিনে বড়ই বিরল। তবু সাধারণ ভক্তদের কাছে সেই করুণা একমাত্র আরাধ্য এবং পাথেয়।

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার :**
*কিঙ্কর সামানন্দ, শ্যামল কুমার বসু এবং অর্ক ঘোষ।*
*লীলাচিন্তা : জনার্দন চট্টোপাধ্যায়।*

# বিপ্লবী জিতেন্দ্রনাথ গৈরিক বসনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ

**অমিত ঘোষদস্তিদার**

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— 'সকল দেশেই জনাকয়েক লোক থাকে যাদের জাতই আলাদা। দেশের মাটি এদের গায়ের মাংস। দেশের জল এদের শিরার রক্ত। শুধু কি দেশের আলো হাওয়া? পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, চন্দ্র-সূর্য, নদী-নালা যেখানে যা কিছু আছে, সব যেন এরা সর্বাঙ্গ দিয়ে শুষে নিতে চায়। বোধহয় এদেরই কেউ কোন সত্যকালে— 'জননী জন্মভূমি' কথাটা প্রথম আবিষ্কার করেন।' ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ বলে গেছেন— 'চরৈবেতি।' অঙ্গীকারে আবদ্ধ বিরল কিছু মানুষ যুগে যুগে আসেন এবং তাদের মহাজীবনকে অগ্নিস্নাত ইতিহাস করে যান।

ধলেশ্বরী-পদ্মা-বুড়িগঙ্গা অবগাহিত বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১৯শে পৌষ জিতেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। বাবা কামাখ্যাচরণ, মা কাশীধামের সর্বজনপ্রিয় 'শাস্ত্রী-মা'। কার্জনের বঙ্গভঙ্গের কুটিল চক্রান্ত আচমকা একদিন জাগিয়ে দিয়েছিল ঘুমন্ত বাঙালি জাতিকে। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র ঝড়ের বেগে উড়ে চলেছে শহর-নগর-গ্রাম-গ্রামান্তরে। মন্ত্রমুখর স্বদেশি মিছিলের পুরোভাগে পতাকা হাতে দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে দুঃসাহসী এক কিশোর। সশস্ত্র বিপ্লবের গোপন প্রস্তুতিতে সেই কিশোর হয়ে উঠল বিপ্লবী জিতেন্দ্রনাথ। অগ্নিযুগ তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল পুলিন দাসের আখড়ায়। মিট্‌ফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলের রেলিং ডিঙিয়ে অনুশীলন সমিতিতে।

জিতেন্দ্রনাথ বিপ্লবী জীবনে সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজ, নরেন মহারাজ, প্রতুল গাঙ্গুলি, আশুতোষ কাহেলি, কেদারেশ্বর সেন এবং আরও কিছু তরুণ বিপ্লবীকে। কাজের মূল কেন্দ্র ঢাকা এবং সিরাজগঞ্জ। জিতেন্দ্রনাথের উপর সার্বিক দায়িত্ব পড়ল সিরাজগঞ্জের। গৃহশিক্ষকের ছদ্মবেশে আস্তানা নিয়েছিলেন সিরাজগঞ্জের অভিজাত লাহিড়ী পরিবারে। ঐতিহাসিক কাঁকোড়ী ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি হয়ে গেল জিতেন্দ্রনাথের প্রিয় ছাত্র রাজেন লাহিড়ীর। অনাহার-অনিদ্রা-জঙ্গল-কারাগার এই নিয়েই অজানা অন্ধকার পথের পথিক হয়েছিলেন তিনি। ১৯১৭ থেকে ১৯২০ সাল, ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ সাল, ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ সাল তিনি কাটিয়ে ছিলেন লোহার গরাদ ঘেরা কারাগারে।

ব্রিটিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংহার মূর্তি ধারণ করেছিলেন ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, প্রীতিলতা, কল্পনা, শান্তি, সুনীতি, উজ্জ্বলা প্রমুখ। বুড়িবালামের তীরে সশস্ত্র যুদ্ধ, রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, বিয়াল্লিশের আগস্ট বিপ্লব ব্রিটিশ শাসককুলকে রীতিমতো কাঁপিয়ে তুলেছিল। নেতাজীর আজাদ- হিন্দবাহিনীর ঐতিহাসিক ইম্ফল অভিযান ব্রিটিশ শাসনের ভিত্ নাড়িয়ে দিয়েছিল। বিপ্লবী জিতেন্দ্রনাথ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আহ্বানে বন্যাত্রাণে কাজ করেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। অংশ নিয়েছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক কংগ্রেস অধিবেশনে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিপ্লবী জিতেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীসদ্ দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেবের সংস্পর্শ লাভ করলেন। তাঁর ভিতরের সত্য, সেবা, সংযমের দুয়ার খুলে গেল। ১৩৫৫ সালের আশ্বিন মাসে মহাষ্টমী মহাযজ্ঞে তিনি শান্তি-মৈত্রী-ত্যাগের প্রতীক গৈরিক বসন ধারণ করে আত্মনিবেদিত সন্ন্যাসী হয়ে উঠলেন। তাঁর নাম হলো ব্রহ্মানন্দ। পলাশীতে আশ্রম তৈরি করলেন। কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন ঘুরে স্বামী দীনার্ত, শোকার্ত, দুঃখার্ত মানুষের পাশে থেকে শান্তির কথা বললেন, মানুষের মনে সাহস অর্জনের বাণী দিলেন। বিবিধের মাঝে মিলনের সুরে নিজেকে মানুষের হৃদয় থেকে হৃদয়ে ভাসিয়ে রেখে, দেশমাতার আশীর্বাদ নিয়ে ১৩৬৩ সালের ৬ মাঘ অক্ষয় আনন্দধামে যাত্রা করলেন। বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়ের দিনে জিতেন্দ্রনাথ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ একই মহাজীবনের দুই আলোকিত রূপ আমাদের রাষ্ট্ররক্ষার্থে শিক্ষিত করে তুলুক। তাঁর আদর্শ পথে এগিয়ে আমরা যেন সাহসী হয়ে উঠি। 'জননী জন্মভূমি'কে যেন শান্তি- শিখরে প্রতিষ্ঠা করতে পারি। ■

# শাশুড়ি-বৌমার সম্পর্ক চিরকালীন, চিরন্তন

অঙ্গনা

**দিঠি মৈত্র**

কয়েকবছর আগে টেলিভিশনের দৌলতে একটা শব্দবন্ধ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, 'সাঁস-বহু' সিরিয়াল। সেখানে যৌথ পরিবারের কাহিনি দেখানো হোত, যেখানে সব চরিত্রের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাড়ির বৌ আর তাঁর শাশুড়ি। কখনও শাশুড়ি একটি সম্পূর্ণ কালো বা ধূসর চরিত্র, কখনও বা তাঁর পুত্রবধূ। দুই পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রায় দেখানোই হোত না। যেন যে-কোনো এক তরফের অত্যাচারে অপরজনের জীবন দুর্বিষহ হতে বাধ্য। শাশুড়ি এবং বৌমা কখনও পরস্পরের বন্ধু হতে পারেন না, দু'জনেই একজন পুরুষ যিনি একজনের পুত্র আর অপরজনের স্বামী--- তাঁকে নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন এবং সংসারের কর্তৃত্বের রাশ নিজের হাতে রাখার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যান। বহু বছর ধরে প্রচলিত এই ধারণারই ভিত শক্ত করেছিল এই সিরিয়ালগুলি। এখনও হাতে গোনা কয়েকটি বাদে জাতীয় টেলিভিশন চ্যানেলগুলির অধিকাংশ পরিবারকেন্দ্রিক সিরিয়ালেই দুই প্রজন্মের দুই নারীর মধ্যে এরকম সম্পর্কই দেখানো হয়।

খুব পিছিয়ে নেই বাংলা সিরিয়ালগুলিও। তবে একটা সময়ে যেমন বাঙালি শাশুড়িমাত্রই দেখানো হোত একজন অত্যন্ত খারাপ, ষড়যন্ত্রকারী মহিলা হিসেবে। এখন তা খানিকটা বদলেছে। পুত্রবধূর প্রতি স্নেহশীল শাশুড়ি-চরিত্র জায়গা করে নিচ্ছে। মূলত মহিলা দর্শকদেরই প্রিয় এইসব সিরিয়াল। সদ্য শুরু হওয়া একটি বাংলা সিরিয়ালের কেন্দ্রীয় চরিত্রই শাশুড়ি এবং বৌমা। অভিজাত, শিক্ষিত, আধুনিকা শাশুড়ি কীভাবে স্নেহে, ভালবাসায় গ্রুমিং করে গ্রাম্য, সরল বৌমাকে করে তোলেন সমাজের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর উপযুক্ত তাই নিয়েই গল্প।

ভেবে দেখার বিষয় হলো শাশুড়ি-বৌমার সম্পর্ক নিয়ে যা কিছু ধারণা প্রচলিত আছে, তার কিছুটা সত্যিও। কিন্তু দু'জন নারীর মধ্যে

এই যে সম্পর্কের টানাপোড়েন, তা কেন? কীসের জন্য নিজেদের মধ্যে সখ্য গড়ে তুলতে অসুবিধা হয় এই বিশেষ সম্পর্কে জড়িয়ে থাকা দুই মহিলার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে শাশুড়ি- বৌমার সম্পর্কের সমীকরণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও টক-ঝাল-মিষ্টিতে এই সম্পর্ক অনন্য, দুই অসমবয়সী নারীর হৃদয়ের টান।

আসলে মেনে না নেওয়ার উপায় নেই, আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ শাশুড়ি-বৌমার সম্পর্কটা কিছুতেই স্বাভাবিক হতে দিতে চায় না। কারণ তাহলে তাদের তৈরি করা সমাজ, সংসারের কাঠামোটা অনেকটাই ভেঙে পড়ে। সেই কারণেই পুত্র, স্বামী, সংসার এইসবের ঘেরাটোপে একটা ঝগড়া, দ্বন্দ্ব ইত্যাদির মধ্যে পরিবারের দু'জন অন্যতম নারীকে আটকে রেখে অধিকাংশ সময়েই চেষ্টা করা হয়েছে তাঁদের স্বাধীন স্বর রুদ্ধ করতে বা সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ না দিতে।

তবে দিন বদল তো হয়ই। তাই তো সময় যত এগিয়েছে, মহিলারা ঘরের আগল ভেঙে পা রেখেছেন বাইরের পৃথিবীতে, স্বাবলম্বী হয়েছেন, ততই বুঝতে পেরেছেন এভাবে একটি সম্পর্ককে শুধুই সাদায়-কালোয় আঁকা সম্ভব হয় না। তাই শাশুড়ি-বৌমার সম্পর্কের ধারাতেও অনেক বদল এসেছে। দু'তরফই একটু একটু করে নিজেদের আড়ষ্টতা কাটিয়ে, নিজের নিজের অস্বস্তির জায়গাগুলো অল্পস্বল্প বদলে নিয়ে সম্পর্কের গভীরতা বোঝার চেষ্টা করেছেন, কাছে এসেছেন।

মায়া মুখার্জীর পুত্রবধূ কৃষ্ণকলি। বিয়ের আগে বাড়ির সবচেয়ে ছোট হওয়ায় বাবা, মা, দাদা, দিদি সকলের আদরে বেড়ে ওঠেন। স্বীকার করেন বিয়ের মাত্র দু'মাস পরেই স্বামী যখন বিদেশ চলে যান, তখন অস্বস্তিতেই পড়েছিলেন। খালি মনে হোত কবে মা, বাবার কাছে যাবেন। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখেছেন কীভাবে ধৈর্যে, স্নেহে, ভালবাসায় শাশুড়ি তাঁকে আপন করে নিয়েছেন, ''আমি গর্ব করে বলতে পারি আমার শাশুড়ি প্রথম দিন থেকেই আমাকে নিজের মেয়ের মতো দেখতে শুরু করেন। আমি একটু লজ্জাই পাই বলতে যে আমি কিন্তু বেশ কিছুদিন ছেলের বৌয়ের মতোই ছিলাম। ওঁর কাছ থেকে ভালবাসা পেয়েই আমি মেয়ে হয়ে উঠেছি।''

কৃষ্ণকলির বক্তব্য, শাশুড়ির সঙ্গে ভালবাসা, বোঝাপড়ার সম্পর্ক তখনই তৈরি হয় যখন নিজের মায়ের সঙ্গে কোনোরকম তুলনা না করে তাঁকে মায়েরই জায়গায় গ্রহণ করে নেওয়া যায়। সেটা করতে পারলেই শাশুড়ির সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকে। নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, তাঁর দিকে শাশুড়ি কীভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, শাশুড়ি থেকে মা হয়ে উঠেছেন। কৃষ্ণকলি তাঁকে দেখে, তাঁর জীবনের গল্প শুনেই বিয়ের আগে এবং বিয়ের পরে নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে পেরেছেন। বললেন, ''এই পরিবারের সবার কাছে যেভাবে উনি আমাকে তুলে ধরেছেন, তাতে সবার মনেই আমার সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা তৈরি হয়েছে। কোনো সমালোচনা শুনতে হয় না আমায়।''

*(সৌজন্যে দৈনিক সংবাদ)*

# ওঝা-গুণিন নয়, সাপে কামড়েছে সন্দেহ হলেই সরকারি হাসপাতালে যেতে হবে

**স্বপন দাস**

বেশ কয়েকবছর আগেকার কথা। একটি ইংরেজি সংবাদপত্রের একটি সংবাদের দিকে চোখ পড়তেই আমাদের দেশের মানুষ চমকে উঠেছিলেন। ২০০৭ সালের ওই প্রতিবেদনে একটি তথ্য দেওয়া হয়েছিল, ২০০৫ সালে অস্ট্রেলিয়ায় যেখানে মাত্র একজন সাপের কামড়ে মারা গিয়েছেন, সেখানে আমাদের দেশে ওই বছরেই একই কারণে মারা গেছেন পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি।

সাপের কামড়ে আমাদের দেশে মৃত্যুর পিছনে কিন্তু অনেক বিষধর সাপ থাকা কারণ নয়, ওষুধ না পাওয়াও কারণ নয়। কারণ হলো অজ্ঞতা। কেননা, আমাদের দেশে যে ২৬৫ প্রজাতির সাপ রয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ৫২টি প্রজাতির সাপ বিষধর। আর পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে মাত্র ৬ প্রজাতির বিষধর সাপ— কালাচ, কেউটে, চন্দ্রবোড়া, গোখরো, শাখামুটি, শঙ্খচূড়। এছাড়াও কিছু সামুদ্রিক সাপ আছে, যাদের বিষ খুব বেশি। তবে আমাদের রাজ্যে বেশি মারা যায় সুন্দরবন অঞ্চলে। আর এদের আঘাত আসে সবচেয়ে বেশি, কালাচ আর কেউটের থেকে।

সাপের কামড়ের একমাত্র ওষুধ অ্যান্টি ভেনাম সিরাম সংক্ষেপে এভিএস আমাদের দেশে যথেষ্টই উৎপন্ন হয়। শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশকেও ভারত সাহায্য করে সেই ওষুধ দিয়ে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাহলে এতজন মারা যাচ্ছে কী করে? একটিই কারণ, ওই অ্যান্টি ভেনাম সিরাম দিতে দেরি হওয়া অথবা ওই ওষুধটির বিষয়ে না জানতে পারা। এ বিষয়ে বলা দরকার, দেশের প্রতিটি হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে এই অ্যান্টি ভেনাম সিরাম পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে, সাপে কাটার ক্ষেত্রে, আক্রান্তের কাছে প্রতিটি মিনিট খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রোটোকল অনুযায়ী সাপের কামড়ের প্রথম ঘণ্টায় দ্রুত শিরার মধ্যে দশটি অ্যান্টি ভেনাম দিতে হবে। যদি কামড়ের পরেই অ্যান্টি ভেনিন দেওয়া যায়, তাহলে অভূতপূর্ব সাফল্য পাওয়া যায়। শুধুমাত্র চন্দ্রবোড়ার ক্ষেত্রে আরও চন্দ্রবোড়া আর গোখরো সাপের কামড়ের জায়গায় প্রচণ্ড ব্যথা হবে। কালাচ কামড়ালে কোনো অংশে কোনো পরিবির্তন হয় না। তবে অতিরিক্ত দশটি অ্যান্টি ভেনাম দিতে হয়। চন্দ্রবোড়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি মিনিট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সাপের কামড় দ্রুত কিডনিকে আক্রান্ত করে। প্রতি মিনিটে এক শতাংশ হারে কিডনি নষ্ট হয়। তাই ডায়ালিসিসের কথাও মাথায় রাখতে হবে। কালাচের কামড়ের ফলে সৃষ্ট কয়েকটি উপসর্গের কথা এই প্রসঙ্গে একটু বলা দরকার। আক্রান্তের চোখ ঢলে পড়লেই বুঝতে হবে কালাচ কামড়েছে। নিয়ম অনুযায়ী সাপের কামড়ের চিকিৎসা করার আগে সাপ চেনা খুব জরুরি। কেননা অনেক সময় নির্বিষ সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে রোগীর বাড়ির মানুষের ভয় আর উৎকণ্ঠা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সাপের কামড় সন্দেহ হলেই রোগীকে একটি টিটেনাস টক্সেড ইঞ্জেকশন শিরায় দিয়ে চিকিৎসকরা ৫ শতাংশ স্যালাইন চালিয়ে দেন। এর মধ্যেই বিষক্রিয়ার লক্ষণ ফুটে ওঠে আক্রান্তের শরীরে।

বিষধর সাপের কামড়ের প্রধান উপসর্গ হলো কামড়ের জায়গাটা ফুলে ওঠা ও যে অঙ্গে কামড়েছে, সেটির নানা পরিবর্তন হওয়া। সাধারণ একটি বিষয় তো সবারই জানা, কামড়ের জায়গায় বাঁধন দিতেই হবে কষে। সেক্ষেত্রে অন্য জায়গায় একটু ফুলে যেতে পারে। অনেক সময় সাপের কামড়ে ওষুধ প্রয়োগের পর একটু বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, সেটি চিকিৎসক সামলে নেবেন। আক্রান্তের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। তবে পরবর্তীকালে অনেক সময়ে কামড়ের জায়গায় জীবাণু সংক্রমণের ঘটনা ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে চিকিৎসকরা অ্যান্টি বায়োটিক ব্যবহার করে, কমিয়ে দেন অস্বস্তি।

শেষে একটিই কথা, সাপের কামড়ে ওঝা, গুণিন কিছু করতে পারবেন না। যদি প্রিয়জনকে বাঁচাতে চান, তাহলে একমাত্র উপায়, হাতের কাছের যে-কোনো সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। আর নিজের পাড়ার নিরাপত্তার স্বার্থে, স্থানীয় হাসপাতাল বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র যাতে অ্যান্টি ভেনাম নিয়মিত ভাবে মজুত রাখে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখুন। কেননা গ্রীষ্মকাল ও পরবর্তী সময়েই সাপের কামড়ের ঘটনা বেশি ঘটে। ■

# যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬


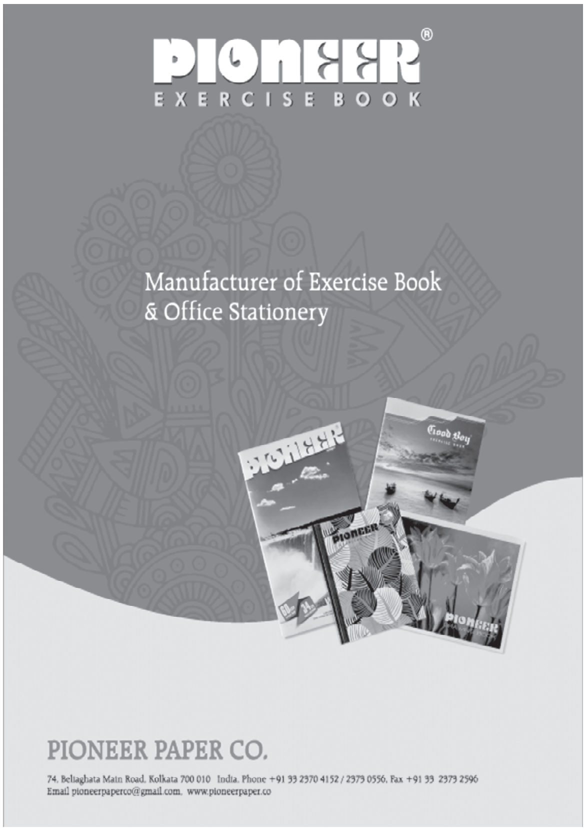

"প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসসমূহের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষকে সুসঙ্ঘবদ্ধভাবে উপস্থাপিত করার এক গঠনমূলক মহতী প্রচেষ্টা ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে। এই উদ্যম অল্পাধিক সার্থকতা অর্জন করেছে পৌরাণিক কাহিনিগুলিতে, রামায়ণ নামক মহাকাব্যে এবং সম্ভবত সর্বাপেক্ষা সার্থক রূপায়ণ মহাভারতে।"

— *ভগিনী নিবেদিতা*

**সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী**

# আজলানে ব্যর্থ স্বপ্নের সওদাগর কুস্তিগিররা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুলতান আজলান শাহ হকি টুর্নামেন্টে ভারত এবার বলার মতো পারফরমেন্স মেলে ধরতে ব্যর্থ। গত বছর সিনিয়র ও জুনিয়র স্তরে ভারত এশিয় ও বিশ্ব পর্যায়ে যথেষ্ট গুরুত্ব ও সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছিল। সিনিয়র ভারতীয় দল এশিয়ান হকিতে চ্যাম্পিয়ন হবার পরপরই জুনিয়র দল দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। যুব পর্যায়ে এর আগেও একবার ভারতীয়রা খেতাব জিতেছিল সেই ২০০১ সালে অস্ট্রেলিয়ার হোবাটে। ২০১৬-র যুব বিশ্বকাপ জয়ী দলটির বেশ কিছু খেলোয়াড়কে সুলতান আজলান শাহর দলে স্থান দেওয়া হয়েছিল। আর একমাত্র সৃজেশ বাদে বাকি সব প্রতিষ্ঠিত সিনিয়র তারকাকে রেখে দেওয়া হয়েছিল। সব মিলিয়ে সিনিয়র জুনিয়র সমন্বয়ে একটি সুষম ভারসাম্যের দল গড়ে পাঠানো হয়েছিল মালয়েশিয়ায় অনেক প্রত্যাশা নিয়ে। কিন্তু ৬ দেশীয় টুর্নামেন্টে ব্রোঞ্জ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

সুলতান আজলান শাহ— মালয়েশিয়ার প্রাক্তন সুলতান ছিলেন আপাদমস্তক হকিপ্রেমী। তাঁর ঐকান্তিক উদ্যোগে ৭০-র দশকে মালয়েশিয়া এশিয়া তথা বিশ্বস্তরে এক উল্লেখযোগ্য শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৫-এ মূলত তারই প্রচেষ্টায় মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে তৃতীয় বিশ্বকাপ হকি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, আর সেই আসরে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারতই, ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে। এরপর সেই কুয়ালালামপুরে বেশ কয়েকবার তাঁর নামাঙ্কিত টুর্নামেন্টে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সেই হিসেবে কুয়ালালামপুরের মাঠ ও সুলতান আজলান শাহ টুর্নামেন্ট ভারতের কাছে সৌভাগ্যের প্রতীক। আর এবছর যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে এক শক্তিশালী দল গড়ে এই টুর্নামেন্ট খেলতে যায় ডাচ কোচ কাম টেকনিকাল ডিরেক্টর রোলাস্ট অল্টম্যানের ভারতীয় দল। প্রথম ম্যাচে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে ড্র, তারপর নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে আশা জাগিয়ে শুরু করেছিল ভারত। কিন্তু তারপরই যেন ছন্দপতন। অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে হেরে তৃতীয় স্থান নির্ধারণের খেলায় নিউজিল্যান্ডকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে মুখরক্ষা করে দেশবাসীর।

সামনের বছর বিশ্বকাপ, কমনওয়েলথ ও এশিয়ান গেমস্। তার আগে এ বছরটা ভারতীয় হকির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে ধারাবাহিক ভাল পারফরমেন্স মেলে

*কুস্তিগির বজরঙ্গ পুনিয়া*

ধরতে পারলে ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপের আগে আত্মপ্রত্যয়ী ও শাণিত দলে পরিণত হওয়ার পথ প্রশস্ত হবে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা সাই এখন ভারতের সিনিয়র ও জুনিয়র দলকে সমস্তরকম সহযোগিতা করছে। ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের খেলায় হকির আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুনরুত্থানের জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট সংশ্লিষ্ট সব মহল। এর যথার্থ প্রতিদান দেওয়াও আবশ্যিক দায়বদ্ধতা রয়েছে খেলোয়াড়দের। বিদেশি কোচ, ফিজিকাল ট্রেনার, উন্নত সাপোর্ট স্টাফ, বিদেশে নিয়মিত টুর্নামেন্ট ও শুভেচ্ছা সফর করানো সবই করছে হকি ইন্ডিয়া ও সরকার। খেলোয়াড়দের উচিত তার কিছুটা অন্তত ফিরিয়ে দেওয়া দেশবাসীকে। গত বছর লন্ডনে বিশ্বসেরা দলগুলিকে নিয়ে হওয়া চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফিতে দুর্দান্ত খেলে ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিল ভারত প্রথমবার। শেষ পর্যন্ত পক্ষপাতিত্বের সুযোগে অস্ট্রেলিয়া ফাইনালটি জিতে বেরিয়ে যায়। তারপর বিশ্ব অলিম্পিকে নিশ্চিত সেমিফাইনাল হাতছাড়া করে ভারত কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়ামের কাছে হারে।

অবশ্য চীনে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ জিতে আবার স্বপ্ন দেখাতে শুরু করে সর্দার, সৃজেশ, সুনীলরা। তারপর জুনিয়র দলের বিশ্বজয়। সব মিলিয়ে ২০১৭ সালটি ভারতের জন্য মণিকাঞ্চন যোগ হয়ে উঠবে এমন আশায় বুক বেঁধেছিল হকি প্রেমীরা। কিন্তু আজলান শাহ টুর্নামেন্ট সেই আশায় জল ঢেলে দেয়। তবে এখনই গেল গেল রব তোলার মতো কিছু হয়নি। এবছর ইউরোপ সফরে যাবে ভারত। দলকে বিশ্বকাপের জন্য গুছিয়ে নেওয়ার অবকাশ ও সুযোগ দুই আছে। খেলোয়াড়রাও যথেষ্ট যোগ্য কোচ ও অন্যান্য সাপোর্ট স্টাফও ভাল কাজ করছে। তাই দেশের মাটিতে বিশ্বকাপে একটা পদক আশা করাই যায়।

অতি সম্প্রতি এশিয়ান বক্সিং ও কুস্তি প্রতিযোগিতায় অবশ্য আশাতিরিক্ত ভাল ফল করেছে ভারত। এশিয়ান বক্সিংয়ে তিন ভারতীয় ফাইনালে উঠে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করে। শিবা থাপা, সুমিত সাঙ্গোয়ান ও মনোজকুমার ফাইনালে ওঠার সুবাদে এ বছরের মাঝামাঝি হতে চলা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপে খেলার যোগ্যতা পেয়ে গেছে। বিখ্যাত ও অতি পরিশীলিত বক্সার বিকাশ কৃষ্ণন কী কারণে সেমিফাইনালে উঠে ওয়াকওভার দিয়ে দেন তাইল্যান্ডের প্রতিদ্বন্দ্বীকে তা নিয়ে অবশ্য ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। আর এশিয় কুস্তি প্রতিযোগিতায় এক ভারতীয় প্রথমবার সোনা জিতলেন। বজরঙ্গ পুনিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার পালোয়ানকে জমি ধরিয়ে দেন সহজেই।

মহিলা বিভাগে সাক্ষী মালিক, ববিতা ভোগত, বিনেসরা ফাইনালে তুল্যমূল্য লড়াই দিয়ে ইরান, মালেশিয়ার আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী মল্লবীরদের কাছে হার স্বীকার করে। সব মিলিয়ে গতবার জেতা ৯টি পদককে ছাপিয়ে এবার ১টি সোনা-সহ দশটি পদক জিততে সমর্থ হয়েছে ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা কুস্তিগিররা। যা পরের বছর কমনওয়েলথ ও এশিয়ান গেমসের সাপেক্ষে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ■

# গাছের ঘুম

গাছ কথা কইতে পারে না; এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে না; তাদের মুখ, চোখ, কান কিছুই নেই। সুতরাং তারা কি করে ঘুমোবে, এই কথাই হয়তো তোমাদের মনে হচ্ছে। কিন্তু গাছেরা সত্যিই ঘুমোয়, তাদের পাতা ও ফুলও ঘুমোয়। গাছেরা মাটি থেকে রস শুষে খায় এবং পাতা মেলে সূর্যের তাপ ও আলো টেনে নেয় এবং ফুলগুলোকে ফুটিয়ে প্রজাপতি ও মৌমাছিদের ডাকে এবং তাদের মধু খাওয়ায়। এই রকম রোজ দিনরাত তাদের অনেক কাজ করতে হয়। এতে গাছপালার শরীরের ক্ষয় এবং ক্লান্তি হয় না কী? কাজেই একটু না ঘুমোলে গাছেরাও বাঁচে না।

যেসব গাছ, সাপ ও ব্যাঙের মতো তিন মাস ধরে ঘুমোয়, আমরা প্রথমে তাদেরই কথা তোমাদের বলব। আদা, হলুদ, ওল, কচু, রজনীগন্ধা প্রভৃতি গাছ তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল এবং শরৎকালে রোদ পেয়ে এই গাছগুলি খুব বেড়ে উঠে। গাদা গাদা কেঁচো ও পোকা খেয়ে ব্যাঙ যেমন মোটা হয়, এই সব গাছের পাতা ও মূল সে রকমে বড় হয়ে দাঁড়ায়। তারপর শীতকাল এলেই এই গাছগুলি ব্যাঙের মতো ঘুমোতে শুরু করে। তখন তাদের পাতা ও ডাল শুকিয়ে যায়। আমরা মনে করি, বুঝি গাছগুলি মরে গেল। কিন্তু তারা মরে না। তারপর গ্রীষ্মকালের বৃষ্টির জল গোড়ায় পৌঁছলেই তারা জেগে উঠে। তারাই তখন নতুন পাতা ছেড়ে বিরাট গাছ হয়ে দাঁড়ায়।

শীতের বাতাস বইতে শুরু করলে আমড়া, জিউলি, শিমুল, গোলকচাঁপা, বাদাম প্রভৃতি গাছের পাতা ঝরতে শুরু করে। তখন একটিও নতুন পাতা গজায় না। দেখলে মনে হয়, যেন গাছগুলি মরে গিয়েছে। এও গাছেদের আর এক রকমের ঘুম। আমড়া, শিমূল প্রভৃতি গাছের ঘুম শামুকের ঘুমের মতো। শীতকাল আসলেই পাতার সার বস্তু এরা গায়ের ছালে জমা করে। সারা শরীর ঢেকে ফেলে এবং শেষে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এ রকম ঘুমন্ত গাছের ছাল তোমরা চুরি দিয়ে একটু কেটে পরীক্ষা করো। দেখবে কর্ক বা সোলার মতো একটা পুরু আবরণ এদের সত্যিই রক্ষা করছে।

আমরা সাধারণত দিনে জেগে রাতে ঘুমোই। এরকম দিনে জাগা রাতে ঘুমোনো গাছ যে কত আছে, তার সংখ্যা হয় না। আমলকী, শিরীষ, তেঁতুল, কৃষ্ণচূড়া, বনফুল প্রভৃতি ছোট পাতলা পাতাওয়ালা অনেক গাছই সারাদিন রোদে পুড়ে মাটির রস খেয়ে সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং ঘুম শুরু করে। লজ্জাবতী যে কেবল লাজুক তাই নয়, ছোট খোকাদের মতো ক্ষণে ক্ষণে ঘুমিয়েও পড়ে। জুজুর ভয় দেখালে আমাদের ছোট খোকাটি যেমন চোখ বুঁজে চুপ করে থাকে, এরাও সেরকম ভয়ে জড়সড় হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তোমরা ওইসব গাছের ঘুম দেখনি কী? তোমাদের কৃষ্ণচূড়া বা তেঁতুল গাছ থাকলে সন্ধ্যার সময় এই গাছগুলিকে লক্ষ্য করো, দেখবে, তাদের ছোট পাতাগুলি দুটি দুটি করে জোড়া থাকে এবং ভোরে রোদ উঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার খুলে যায়। তেঁতুল, আমলকী, কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি গাছ এ রকমেই ঘুমোয়।

গাছপালারা আবার কুকুর বেড়ালের চেয়েও অধম। তাদের হাত নেই, পা নেই, লেজও নেই। তাই পাতাগুলিকে গুটিয়ে তারা শরীরের তাপ রক্ষা করে। তোমরা হয় তো ভাবছ, গাছেদের আবার গরমের দরকার কী? দরকার খুবই আছে। দিনের বেলায় সূর্যের যে তাপ তারা পাতা দিয়ে শুষে শরীরে জমা করে, তা শরীর থেকে বের হয়ে গেলে গাছেরা খাবার হজম করতে পারে না। তাই ওই সব গাছ পাতা গুটিয়ে শরীরের তাপ রক্ষা করে এবং তারপরে ঘুমোয়।

ফুলের ঘুম তোমরা দেখনি কী? জবা, পদ্ম, স্থলপদ্ম, লাউ, কুমড়ো প্রভৃতি ফুল দিনে জেগে রাতে ঘুমোয়। তোমরা সারা পদ্মপুকুর খুঁজেও রাতে একটিও ফোটা পদ্মফুল পাবে না। আবার রজনীগন্ধা, কুমুদ, মল্লিকা, যুঁই, চামেলি, সন্ধ্যামালতি প্রভৃতি রকম রকম ফুল দিনে ঘুমিয়ে সারা রাত জেগেই কাটায়। এজন্য দিনের বেলায় সারা বাগান খুঁজেও তোমরা টাটকা যুঁই বা চামেলির খোঁজ পাবে না।

রঙিন পাপড়ি মেলে লাউ কুমড়োর ফুল, জবাফুল এবং আরও কত রঙিন ফুল দিনে ফুটে উঠে। শরৎকালের ভোরবেলায় তোমরা যদি পদ্মবনের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পার, তবে দেখবে, পদ্মবনে যেন ভ্রমর, মৌমাছি ও প্রজাপতিদের মেলা বসে গিয়েছে। মধু খাবার জন্য এক ফুল থেকে আর এক ফুলে তাদের কত লাফালাফি এবং দৌড়াদৌড়িই চলে। ফুলের রঙও রাতের অন্ধকারে প্রজাপতির নজরে পড়ে না। এজন্যই রাতের ফুলে প্রায়ই বেশি রঙচঙ দেখতে পাওয়া যায় না। এগুলির রঙ প্রায়ই সাদা হয়। এই সাদা রঙ দেখে এবং সারা রাত ফুল থেকে যে গন্ধ বের হয়, তা শুঁকেই প্রজাপতিরা ফুলে এসে বসে। তারপর ভোর বেলায় যেমনি তারা বাসায় ফিরে যায়, তেমনি পাপড়ি বুজে ফুলেরা ঘুমোতে শুরু করে, অথবা ঝরে মাটিতে পড়ে।

*জগদানন্দ রায়*
*(সংক্ষেপিত)*

## ভারতের পথে পথে

### শৃঙ্গেরী

কর্ণাটক রাজ্যের চিকমংগালুর জেলায় সহ্যাদ্রি পর্বতের উপর শৃঙ্গেরী শহর। অষ্টম শতাব্দীতে আদি শঙ্করাচার্য শৃঙ্গেরীতে তুঙ্গনদীর তীরে অদ্বৈত বেদান্ত মঠ স্থাপন করেন। রাজধানী ব্যাঙ্গালুরু থেকে ৩০৩ কিলোমিটার দূরে শৃঙ্গেরীশহর। এখানের শারদম্বা মন্দির, বিদ্যাশঙ্কর মন্দির, সিরিমেন ও হনুমানগুণ্ডি জলপ্রপাত দর্শনীয় স্থান। শৃঙ্গেরীর প্রকৃত নাম শৃঙ্গগিরী পর্বত। এখানে শৃঙ্গীঋষির জন্মস্থান রয়েছে। কাছেই একটি পর্বতচূড়ায় শৃঙ্গীঋষির পিতা বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম রয়েছে।

## এসো সংস্কৃত শিখি

**একত্র অধ্যাপকঃ অস্মি।**

এক জায়গায় অধ্যাপক আছি।

**ইদানীং কুত্র বাসঃ ?**

এখন কোথায় থাকছ?

**এষঃ মম গৃহসঙ্কেতঃ।**

এটা আমার বাড়ির ঠিকানা।

**যানম্ আগতম্, আগচ্ছামি।**

গাড়ি এসে গেছে, আসছি।

**অস্তু, পুনঃ মিলামঃ।**

ঠিক আছে, আবার দেখা হবে।

---

## ভালো কথা

### চিলের ছানা

আমাদের বাড়ির বাগানে নারকেল গাছে অনেকদিন থেকে দুটো চিল বাসা বেঁধে থাকে। এবার ওদের বাসায় দুটো ছানা হয়েছে। আমি আর দিদি ছাদ থেকে রোজ একবার বাচ্চা দুটোকে দেখি। সেদিন সকালে মা চিল খুব চিৎকার করছে। মা বললো রাতের ঝড়ে একটা বাচ্চা নীচে পড়ে গেছে। আমরা বাগানে গিয়ে বাচ্চাটিকে তুলে এনে ছাদের চিলেকোঠায় রেখে দিই। আমরা চিন্তা করছি বাচ্চাটিকে কী খাওয়াবো। তখনই মা-চিল মুখে মরা ইঁদুর নিয়ে এসে আমাদের থেকে একটু দূরে বসলো। আমরা একটু সরে যেতেই বাচ্চার কাছে এসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়াতে লাগলো। বাচ্চাটির ভালো হতে সাতদিন লেগেছিল। পরে একদিন ওর মা-বাবা ওকে নারকেল গাছে নিয়ে যায়। এখন ওদের সঙ্গে আমার আর দিদির খুব ভাব হয়ে গেছে।

**ঋতম দাস, দশম শ্রেণী, উলুবেড়িয়া, হাওড়া।**

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## শব্দের খেলা

*লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে*

(১) ক মু চ রো

(২) ণ ক জ ল্যা

*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*

(১) গা রো প কা ট

(২) ব য দা ন্ত্র ন

**১৫ মে সংখ্যার উত্তর**

(১) পরাগরেণু (২) তল্পিবাহক

**১৫ মে সংখ্যার উত্তর**

(১) মরুদ্যান (২) তটভূমি

**উত্তরদাতার নাম**

(১) যাদব দাস, বরাবাজার, পুরুলিয়া (২) রূপম দে, সোনারপুর দঃ ২৪ পরগনা
(৩) সৈকত মাহাতো, ঝিলিমিলি, বাঁকুড়া (৪) শুভম ঘোষ, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

*সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।*

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

**শব্দরূপ-৮৩৪** ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ১ | | ২ |
| ■ | ৩ | | ৪ | ■ | | ■ | |
| ৫ | ■ | ■ | ৬ | | | ■ | |
| ৭ | | | | ■ | ■ | ■ | |
| | ■ | ■ | ■ | ৮ | | | |
| | ■ | ৯ | | | ■ | ■ | |
| | ■ | | ■ | ১০ | | | ■ |
| ১১ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

**সূত্র :**

**পাশাপাশি :** **১.** ইহুদি, খ্রিস্টান পুরাণোক্ত আদিমানব, **৩.** 'কিরাতার্জুনীয়' রচয়িতা সংস্কৃত কবি, **৬.** কপট পাশাখেলা, **৭.** যোগশাস্ত্রে গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যবর্তী অঙ্গুলিদ্বয়-পরিমিত স্থান। **৮.** খসড়া, পাণ্ডুলিপি, **৯.** কৈকেয়ীর কুব্জা দাসী, **১০.** স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, **১১.** কন্দর্প; দনু নামক অসুরের পুত্র।

**উপর-নীচ :** **১.** বুক পর্যন্ত ('—মূর্তি'), **২.** মোগলযুগে জায়গিরপ্রাপ্ত সেনাপতির উপাধি, **৪.** কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, **৫.** ইন্দ্র; সংস্কৃত কথাসাহিত্যে উল্লিখিত, বিদ্যাধরগণের ভূপতি আত্মত্যাগী মহাপুরুষ, **৮.** কৃষ্ণ; মুর-দৈত্য-নাশক, **৯.** ব্রহ্মার পুত্র, কশ্যপের পিতা।

**সমাধান**
**শব্দরূপ-৮৩১**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শি | ব | ম | ■ | বি | শ্বা | মি | ত্র |
| বা | ■ | হা | ■ | য | ■ | ■ | স |
| নী | ■ | প্র | বা | হ | ■ | ■ | র |
| ■ | ■ | স্থা | ■ | রি | ম | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ন | গ | ■ | হা | ■ | ■ |
| না | ■ | ■ | র | স | স্থ | ■ | লে |
| র | ■ | ■ | মি | ■ | বি | ■ | জু |
| দ | ম | ক | ল | ■ | র | গ | ড় |

**সঠিক উত্তরদাতা**

**সুনীল বিষ্ণু**
**সিউড়ী, বীরভূম**
**শ্যামল দাস**
**চাঁচোল, মালদা**

*শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।*
*খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।*

- ৮৩৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ৫ জুন ২০১৭ সংখ্যায়

## লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

# বিজেপি বিরোধীরা আজ নিঃস্ব, নিরস্ত্র

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

একটু নজর করলেই দেখা যায় ২০১৪ সালে দ্বিতীয় এনডিএ সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে একটা নাড়াচাড়া পড়ে গেছে। সংশ্লিষ্ট মানুষজনের অর্থাৎ আমলাশ্রেণী, বিভিন্ন দলের দলপতিবৃন্দ, নানা ধর্মের ধর্মাধিকারী কেউ বিরোধিতায় মুখর হচ্ছেন, কেউ আবার এ যাবৎ অশ্রুত কথা নির্দ্বিধায় বলে বসছেন। যেমন ধরুন ব্যক্তি জীবনের ভোগস্পৃহা মেটাতে যুগযুগান্তব্যাপী অভ্যস্ত মোল্লাশ্রেণী এতটাই ক্ষেপে গেছেন যে তিন তালাক প্রথা বজায় রাখতে ভারতে বসেই তাঁরা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর চুল দাড়ি উপড়ে নেওয়ার হুঙ্কার দিচ্ছেন। দেশের ৭০ শতাংশ অঞ্চল শাসন করা দলের রাজ্য সভাপতির মাথার ওপর ফতোয়া জারি করছেন। অন্যদিকে সুদূর কাশ্মীরে স্বাধীনতার পর থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে আপস করে আসা পাকিস্তানপন্থী ফারুক আবদুল্লার দল ক্ষমতা হারিয়ে জেহাদিদের পেছন থেকে কেন, প্রায় সামনাসামনিই মদত দিচ্ছে। এরা এতদিন পাকিস্তানপন্থী নেতাদের বুঁঝিয়ে সুঝিয়ে অর্থানুকূল্যে তাদের হয়তো গরম করতেন। সেই ফাঁকে কাশ্মীরে অন্য কারুর শিল্পোদ্যোগ করার নিষেধ থাকার সুযোগ নিয়ে যেটুকু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হোত তার মধু নিজেরাই ভাগবাটোয়ারা করে নিতেন। শ্রীনগরে কয়েকশো মিটার অন্তর মসজিদ ছেয়ে আছে। এগুলি সবই জেহাদিদের ধর্মীয় কম্বলে ঢাকা আবাসস্থল। কেন্দ্রীয় সরকার নভেম্বরে বিমুদ্রীকরণ চালু করার পর সাধারণ নাগরিকদের যে অংশ জেহাদিদের মদত দিত তাদের টাকা ব্যাঙ্কে চলে যাওয়ায় টাকা জোটাতে ব্যাঙ্ক লুট শুরু হয়েছে। জেহাদিদের কমান্ডার বুরহান ওয়ানিকে খতম করা ও পাকিস্তানের মাটিতে সার্জিকাল স্ট্রাইকের পর প্রায় 'আর পার' কি লড়াই চলছে। সব কিছু

প্রকাশ্যে না হলেও এর হেস্তনেস্ত হবেই। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে চতুর ফারাক আবদুল্লা অবশ্য সামান্য কিছু ভোট পেয়ে লোকসভার আসনটি কবজা করে নিয়েছে। ভারতের সংসদে এমন দেশবিরোধী ব্যক্তির উপস্থিতি বিপজ্জনক।

অন্যদিকে এই প্রথম স্বাধীনতার পর মৌচাকে ঢিল পড়েছে। দেশ জুড়ে কামান্ধ মোল্লাদের মতের তোয়াক্কা না করে মুসলমান মহিলারা চরম অবমাননাকর 'তিন তালাক প্রথা'র বিলোপ চাইছেন। সরকার আদালতে স্পষ্ট হলফনামা দিয়ে মুসলমান মহিলাদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গ থেকেই নির্যাতিতা ও তালাক বিরোধী লক্ষাধিক মহিলার সই সংগ্রহ করে ৯ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতির দপ্তরে আবেদন জমা পড়েছে। অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবী সৈয়দ তনভির নাসরিনের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টে তিন তালাক মামলার ঐতিহাসিক শুনানি শুরু হওয়ার আগেই যন্তর মন্তরে তাঁরা ধরনায় বসেছেন। মুসলিম ধর্মগুরুদের মধ্যেই ফাটল দেখা দিয়েছে। এই ধরনের ঘটনার অভিঘাত অভূতপূর্ব হতে পারে। এমনটা কয়েক বছর আগে আক্ষরিক অর্থে অচিন্ত্যনীয় ছিল। তার প্রমাণ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার যেহেতু অবকাশ ছিল না, কেননা ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোট যার অধিকাংশই হয়তো পুরুষ ভোট অনুযায়ী ঠিক হয়। তাকে গুদামজাত রাখতে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষবিভূষণ মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পৃথুল শিক্ষামন্ত্রী মোল্লা সমভিব্যাহারে বিতর্ক জন্মের মুহূর্তেই তড়িঘড়ি তিন তালাকের পক্ষে থাকার নিরাপদ নির্লজ্জ নিদান দিয়েছেন। ওই যে বলছিলাম অনেকেই এযাবৎ না শোনা অনেক কিছু বলে ফেলেছেন। পুরীর মন্দিরের এক দয়িতাপতি দুম করে দিদিকে 'মুসলমান' বলে মন্দিরে ঢোকার বিরোধিতা করলেন। ভাগ্যিস করেছিলেন হুঁশ হলো দিদির। এঁটো, সগড়ি, ভরপেট, উপবাস কিছুই না মেনে শুধু ভোট নিশ্চিত করতে তিনি কি না করেছেন! ধুমধাড়াক্কা হিজাব পরে দোয়া করছেন। রমজান মাসে রোজা না রেখে আগণ্ড ইফতার প্রসাদ খাচ্ছেন। এইবার তাঁর সত্যনারায়ণ পুজোর সময় সমাগত। তিনি টাটকা ধর্মান্তরিত হয়ে নিজেকে হিন্দু বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর রাজ্যসভার সন্দেহজনক সাংসদও প্রায়শই রুদ্রাক্ষ নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। তাঁদের প্রভু টিপু সুলতান মসজিদের দুর্বৃত্ত ইমাম বরকতি বলছেন— সরকার- ফরকার জানি না, লালবাতি গাড়ি আমার বাপের অধিকার। ধন্য ধর্মনিরপেক্ষতা!

আবার উত্তরপ্রদেশের দিকে তাকান। আমাদের আজীবন শোনা বুদ্ধিজীবীর বুলিতে খুবই ফ্যাশানেবল সফ্‌ট হিন্দুত্ব বা সেই জনতা

আসলে যত্নে উৎপাদিত দীর্ঘ লালিত হিন্দুত্বের 'গোপন এজেন্ডা' ইত্যাদিকে এলেবেলে করে দিয়ে একেবারে আচার সূত্রে সন্ন্যাসী হিন্দু গেরুয়াধারী আসীন হয়েছেন ভারতের বৃহত্তম ২২ কোটি জনসংখ্যার রাজ্যে। এমন সব দুঃসাহসিক কিন্তু আদ্যন্ত ভণ্ডামিহীন কাণ্ডকারখানা দেখতে অভ্যস্ত উত্তরপ্রদেশের ভাগবাটোয়ারা-জাতপাতের বণিকেরা। তাঁরা এই জয়যাত্রায় পথপ্রান্তে পড়ে রইলেন। ক্ষমতা উত্থান পতনের লীলাভূমি দিল্লিতে নিছক অসূয়াপরায়ণ অক্ষম কেজরিওয়াল তার পেশাগত খেউড়ে খেলনা ইভিএম নিয়ে ব্যক্তিগত দুর্নীতির কর্কট ব্যক্তিতে আক্রান্ত। অপরিচিত পট পরিবর্তনের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে অর্থনীতির বিমুদ্রীকরণের মতো ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপের সুফল বা জিএসটি বিলের পাশ হয়ে যাওয়া।

দাক্ষিণাত্যে সর্বোচ্চ আদালতের ঐতিহাসিক রায়ে নিছক মোসায়েবি করে মুখ্যমন্ত্রী হতে যাওয়া তছরূপকারী শ্রীমতী শশীকলা এখন জেলে আশ্রয় নিয়েছেন। একথা বললে অন্যায় হবে না সরকারের সঙ্গে সঙ্গে মহামান্য আদালতও সমান সক্রিয়, অনুপ্রাণিত। সদ্য কলকাতার মহাজাতি সদনে বুদ্ধিজীবীদের সম্মেলনে তাঁর ভাষণে বিজেপি সভাপতি দেশে যথার্থ অর্থে গণতান্ত্রিক পুনরুজ্জীবনের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, বিজেপি দলে তাঁর পর কে সভাপতি হবেন একথা বলতে বাজি ধরতে হবে। কিন্তু কংগ্রেস বা সমাজবাদী বা বসপা বা তৃণমূলের মতো আর পাঁচটা দলের ক্ষেত্রে তা কোনো ধাঁধার বিষয় নয়। এগুলি যে মালিক কেন্দ্রিক উদ্যোগ। বাস্তবিক, আমাদের রাজ্যে জন্মসূত্রেই অভিষিক্ত হয়ে আছেন কুমার অভিষেক।

স্বস্তিকার পাতায় তার মুখ ব্যাজার করা চিত্র দেখে ভ্রম হয় হয়তো বা 'ভারত ছাড়ো' বা 'চলো দিল্লির' ডাক দিচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার কোনো পূর্ব ইতিহাস আছে কী? পকেটের পয়সায় বিদেশ থেকে প্রয়াত রাজশেখর বসুর ভাষায় 'কয়েকটা হরফ আনিয়েছেন 'হয়তো এমবিএ বা কিছু। ইতিমধ্যেই বখরার গণ্ডগোল নিয়ে বংশানুক্রমিক রাজনীতির বিষবৃক্ষে আরও একটি আকাশ নামের কুসুম নাকি বিকশিত হয়ে উঠছে। দিদির ভাষায় 'ধমকানো চমকানোতে, এই নবীনতর ভাইপোটি এমনই স্বনামধন্য। পুলিশ-টুলিশ পিটিয়ে হাত পাকিয়েছেন। তবে এই রাজনৈতিক ইমারতগুলি যে ভেঙে পড়ছে সারা ভারতব্যাপী নির্বাচন ও তৎপরবর্তী নেতা নির্ধারণের ক্ষেত্রেই তা প্রতীয়মান। অসমে সর্বানন্দ সোনোয়াল নাগরিকত্ব বিল কার্যকর করতে বদ্ধপরিকর। উত্তরপ্রদেশে সব গ্রামে আলো, জল পাঠাতে যোগীজী দিন রাতের ব্যবধান ছোট করে আনছেন। রাজনীতিতে এঁরা কিছু অবদান রেখে যেতে চান। কিছু নিয়ে যেতে আসেননি বলেই মানুষ বিশ্বাস করছেন। এর বিপরীতে পশুখাদ্যের অর্থ গলাধঃকরণের অভিযোগে শঙ্কিত লালুর জেলযাত্রার পুনর্সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। এঁরাই আবার তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ে ভারত শাসনাভিলাষী! ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় দলগুলি হিন্দু-মুসলমান, উঁচু জাত, নীচু জাত, স্বজাত, পুজিবাদী সর্বহারা এমন সব চালু সমীকরণের আওতায় খেলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করে। বিগত কয়েক মাসের ভারতব্যাপী নানান নির্বাচনের বিস্ফোরক ফলাফলে চেনা ছকগুলি হঠাৎ অথর্ব হয়ে পড়েছে। পরস্পর ঘোর শত্রুরা দিশেহারা। একে অপরের গলা জড়িয়ে বাঁচতে চাইছে।

রাজনীতির খেলায় হার-জিত আছে। এ তো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়েরা জানতেনই, তবে হয়তো জানতেন না পথে বিজেপি নামক একটি দল ও তার নরেন্দ্র মোদী নামের অবিসংবাদিত এক নেতা রাজনীতিতে বিরোধীদের নীতি, আদর্শ, কর্মসূচি নামের যাবতীয় আবশ্যিক পরিধেয়গুলিকে এমন হেলায় হরণ করে নেবে। বিরোধী রাজনীতি আজ সত্যিই নিঃস্ব, নিরস্ত্র। ■

# ব্রিটেনে ভয়ঙ্কর জঙ্গি হানা শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

লন্ডনের ম্যাঞ্চেস্টার এরিনায় ভয়াবহ আত্মঘাতী হামলার ফলে এখনও পর্যন্ত ২২ জন মারা গেছেন। আহত প্রায় ৫৯। বিখ্যাত আমেরিকান সঙ্গীতশিল্পী আরিয়ানা গ্রাঁদের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার ঠিক পরেই বিস্ফোরণ ঘটে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, আমি ব্যথিত। ভারত ব্রিটেনের পাশে রয়েছে।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
29 May - 2017 - Rs. 10.00,

With Best
Compliments from

A
Well
Wisher

S.B.

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০্ টাকা।।